দারুল ইসলাম ও দারুল হরব প্রসঙ্গে

মুফতি তাকি উসমানী সাহেব দা.বা.

এর

দাবির পর্যালোচনা

মুফতি

আব্দুল ওয়াহহাব (দা.বা.)

দারুল ইসলাম ও দারুল হরব প্রসঙ্গে মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা.এর দাবির পর্যালোচনা

মুফতি আব্দুল ওয়াহহাব (দা.বা.)।

দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের মাসআলা ইসলামী শরীয়তের একটি বুনিয়াদি মাসআলা যার উপর আরো অসংখ্য মাসআলার ভিত্তি। ‘ফিকহ’ তথা ইসলামী আইন শাস্ত্রের সকল কিতাবেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর আলোচনা রয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করে অসংখ্য অগণিত মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

মুফতী শফী রহ. বলেন:

جو لوگ فقہ اور فتاوی سے مناسبت رکھتے ہیں ان پر یہ بات مخفی نہیں کہ تقریبا فقہ کے تمام ابواب نماز، روزہ، نکاح، طلاق اور بالخصوص بیع وشراء، اجارہ و دیگر معملات میں سیکڑو مسائل شرعیہ دار الاسلام کے لیئے کچھ ہے اور دار الحرب کے لیئے دوسرا۔ اس لیئے اگر یوں کہا جائے کہ احکام شرعیہ کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر موقوف ہے کہ ان پر عمل کرنے والے جس ملک میں آباد ہے پہلے اسکا دار الاسلام یا دار الحرب ہونا متعین کریں تو بالکل صحیح ودورست ہے۔

“যারা ফিকহ ও ফতোয়ার সাথে সম্পর্ক রাখেন তাদের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত, বিবাহ-তালাক, বিশেষত : ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারা এবং অন্যান্য মুআমালা সহ ফিকহের প্রায় সকল অধ্যায়ের অসংখ্য শরয়ী মাসআলা দারুল ইসলামে এক রকম, দারুল হরবে অন্য রকম।

এ কারণে যদি বলা হয়, “শরীয়তের আহকামের একটা বিশাল বড় অংশ এমন রয়েছে যেগুলোর উপর আমল করার জন্য প্রথমে বসবাসরত রাষ্ট্র কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব তা নির্ণয় করে নেয়া পূর্বশর্ত” যদি এমন বলা হয় তাহলে তা সম্পূর্ণ সঠিক।”

[জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৫/২০৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খেলাফতের পতনের পর নতুন করে এ মাসআলার আলোচনার প্রয়োজন পড়ে। কারণ কাফেররা বিশাল খেলাফতকে ভেঙে টুকরা টুকরা করে একেক অংশে নামধারী একেক মুসলমানকে শাসন ক্ষমতায় বসায়। তারা আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকে। আর যারা আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে আইম্মায়ে কেরামের ইজমা-ঐক্যমতে তারা মুরতাদ। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের পর্যাপ্ত ফতোয়াও এ ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে।

তদ্রুপ আইম্মায়ে কেরাম এ ব্যাপারেও একমত যে, ইসলামী শাসনাধীন কোন রাষ্ট্র কাফের বা মুরতাদরা দখল করে নিয়ে তাতে ইসলামী শাসন রহিত করে কুফরী তথা শরীয়ত

বিরোধী শাসন চালু করে দিলে এবং মুসলমানরা তাদের থেকে তা উদ্ধার করে ইসলামী শাসন জারি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে উক্ত রাষ্ট্র আর 'দারুল ইসলাম' তথা ইসলামী রাষ্ট্র থাকে না, বরং 'দারুল কুফর' তথা কুফরী রাষ্ট্র হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে কোন দ্বিমত নেই।

এ হিসেবে বর্তমানে শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দ্বারা শাসিত গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দারুল হরব। নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের অনেক লেখা এবং ফতোয়া এ ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে।

কিন্তু বর্তমান উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এ উভয়টি বিষয়েই ভিন্নমত পোষণ করেন।

প্রথমতঃ তিনি কুফরী আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মুসলিম নামধারী মুরতাদ শাসকদেরকে মুরতাদ মানেন না।

দ্বিতীয়তঃ এদের ক্ষমতাধীন কুফরী আইন দ্বারা শাসিত গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে দারুল হরব মানেন না। বরং তিনি এ সবগুলো রাষ্ট্রকে 'দারুল ইসলাম' তথা 'ইসলামী রাষ্ট্র' মনে করেন।

তাঁর এই দুই দাবির কারণে উপমহাদেশে (বিশেষত বাংলাদেশে যেখানে ওলামায়ে কেরামর বিশাল অংশ তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর মতো ব্যক্তিদের অনুসরণ করে থাকেন) কী পরিমাণ বিভ্রান্তি যে ছড়াচ্ছে অস্পষ্ট নয়।

আপনি আজ ওলামায়ে কেরামের কাছে এই দুই মাসআলা আলোচনা করতে গেলে তাদের অনেকে শুধু এ কথাটাই বলবেন- তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. তো এর বিপরীত বলেন! এমতাবস্থায় তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর উক্ত দাবিদ্বয়ের দলীলভিত্তিক পর্যালোচনা করে তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা নির্ধারণ করা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই এ ব্যাপারে কলম ধরা। তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তার যোগ্যও নই। আর এত কোন ফায়েদাও নেই। তবে –

لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة

[দ্রুতগামী অশ্ব কখনো মুখ থুবরে পড়ে এবং ধারালো চাপাতি কখনো ভোঁতা হয়ে যায়।]

অতএব, বড়দের ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। আর ভুলকে ভুল হিসেবে ধরিয়ে দিয়ে উম্মাহকে তা থেকে রক্ষার পথ বাতলে দেয়াই প্রকৃত খায়ের খাহী। কিংবা অন্তত যদি

আমার বুঝে না আসে তাহলে একজন তালিবে ইলম হিসেবে দাবির পক্ষে দলীলের আবেদন করার অধিকার নিশ্চয়ই আমার রয়েছে।

তবে আমি এ পুস্তিকাতে শাসকগোষ্ঠীর মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না। তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম দাবি করতে গিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের যেসব বক্তব্যকে দলীল দলীল হিসেবে পেশ করেছেন সেগুলো পর্যালোচনা করাই এ পুস্তিকার মূল উদ্দেশ্য।

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. তাঁর **"ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত"** নামক কিতাবে এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলে দাবি করেছেন। তার এ দাবির পক্ষে তিনি হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট তিন জন ইমামের তিনটি উদ্ধৃতি এনেছেন।

১ম জনঃ শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০ হি.)। যিনি 'আল-মাবসূত' এবং 'শরহুস সিয়ারীল কাবীর' এর প্রণেতা।

২য় জনঃ 'জামিউর রুমুজ' এর প্রণেতা আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.)।

৩য় জনঃ 'ফাতাওয়া শামী'র প্রণেতা আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.)।

তিনি এই তিন ইমামের উদ্ধৃতিত্রয় এনে বুঝাতে চাচ্ছেন-

[বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যেগুলোতে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত কায়েম নেই, বরং সেসবের শাসকরা আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে সেগুলো সব 'দারুল ইসলাম' তথা 'ইসলামী রাষ্ট্র'। আইন কি চলছে সেটা দেখার বিষয় নয়। আইন ইসলামী হোক কুফরী হোক সর্বাবস্থায়ই সেগুলো 'দারুল ইসলাম' তথা ইসলামী রাষ্ট্র।]

এই তিন ইমামের উদ্ধৃতিত্রয় এনে তিনি একথাও বুঝাতে চাচ্ছেন-

[এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র বলা নিজস্ব মনগড়া কোন কথা নয়; বরং পূর্বসূরি ইমামগণের মতানুসারেই সেগুলো দারুল ইসলাম। তাঁদের কারো বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আর কারো বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্টই বুঝা যায়।]

অর্থাৎ প্রথম দুইজন ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০) এবং আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আর

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

অথচ বাস্তবে এই তিন ইমামের কারো বক্তব্য থেকেই এসব রাষ্ট দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া বুঝা যায় বলে মনে হচ্ছে না। ইমামগণের বক্তব্যগুলোর পর্যালোচনা এবং সেগুলোর সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র দেখার পর তাঁদের বক্তব্য অনুসারে এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলার কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর বক্তব্য এবং তার পর্যালোচনায় যাওয়ার পূর্বে বর্তমান কুফরী শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকরা মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ওলামাদের কয়েকটা ফতোয়া উল্লেখ করবো।

***

❖ কুফরী শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে কুফরী শাসন গ্রহণ করার ফিতনা এই উম্মতের মাঝে দুইবার দেখা গেছে।

প্রথমবারঃ তাতারীদের যামানায়।

দ্বিতীয়বারঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খেলাফেতের পরাজয়ের পর।

❖ তাতারীদের যামানাঃ

তাতারীরা তুর্কি জাতি। তুর্কিস্তান সংলগ্ন চীনে ছিল তাদের বসবাস । দৈহিক ও সামরিক দিক থেকে তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী । সংখ্যায় ছিল অগণিত। তাদের পুরুষ মহিলা সকলেই যুদ্ধে পারদর্শী। প্রথমে তারা কাফের ছিল।

৬১৬ হিজরীর দিকে তারা মুসলিম বিশ্বে আক্রমণ চালায়। প্রথমে খাওয়ারিজম ও তার আশপাশের এলাকাগুলোতে হামলা চালায়। একে একে বুখারা, সমরকন্দ সহ মা ওরাউন নহর ও খোরাসানের দেশগুলো দখল করে নেয়।

৬৫৬ হিজরিতে তৎকালীন আব্বাসী খেলাফতের রাজধানী বাগদাদে প্রবেশ করে। খলীফার শীয়া উজির ইবনে আলক্কামীর প্ররোচনায় তারা খলীফাকে হত্যা করে। এরপর বাগদাদে প্রবেশ করে নজির বিহীন হত্যাযজ্ঞ চালায়।

তৎকালীন শামের অনেকাংশও তারা দখল করে নেয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে ইসলামী খেলাফতের বিশাল অংশ তারা দখল করে নেয়।

তবে ইসলামী শাসনকে তারা অবলুপ্ত করেনি। মুসলমানদেরকে তারা শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করার সুযোগ দেয়।

তবে তারা নিজেরা তাদের নেতা চেঙ্গিস খানের রচিত **'ইয়াসিক'** নামক সংবিধান অনুযায়ী চলত। চেঙ্গিস খান তা বিভিন্ন ধর্মের নিয়ম নীতি এবং তার নিজস্ব চিন্তা ধারার সমন্বয়ে রচনা করেছিল। তাদের পারস্পরিক বিচার কার্য এই 'ইয়াসিক' দিয়েই চলত।

৬৮০হিজরিতে তাতারীরা মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের বিরোদ্ধে যুদ্ব অব্যাহত রাখে।

মুসলমান হওয়ার পরও তারা তাদের পূর্বের সংবিধান **'ইয়াসিক'** অনুযায়ীই চলতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সংবিধান আগের মতো **'ইয়াসিক'ই** রয়ে যায়।

 আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাদ দিয়ে কুফরী সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করার কারণে তৎকালীন ওলামায়ে কেরাম তাদেরকে কাফের ফতোয়া দেন।

· যারা ইসলামী আদালতে বিচারের জন্য না গিয়ে তাতারীদের আদালতে বিচারের জন্য যাবে ওলামায়ে কেরাম তাদেরকেও কাফের হয়ে যাবে বলে ফতোয়া দেন।

· যারা তাতারীদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে তারাও কাফের হয়ে গেছে বলে ফতোয়া দেন। এদের মধ্যে প্রখ্যাত মুফাসসির, তাফসীরে ইবনে কাসীরের প্রণেতা হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু-৭৭৪হি.) এর ফতোয়া এবং ইবনে কাসীর রহ. এর উস্তাদ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু-৭২৮হি.) এর ফতোয়া সর্বজন প্রসিদ্ধ।

- **হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু-৭৭৪হি.) এর ফতোয়াঃ**

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. এর এ ব্যাপারে দু'টি ফতোয়া রয়েছে।

একটি- তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা মায়েদার ৫০ নং আয়াত-

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

“তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসন ব্যবস্থা কামনা করে! বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?” এর ব্যাখ্যায়।

অপরটি - তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ **‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’** তে ৬২৪ হিজরীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে যেখানে চেঙ্গিস খানের আলোচনা এসেছে সেখানে।

চেঙ্গিস খান ৬২৪ হিজরিতে মারা যায়। এজন্য ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ তে তার প্রসঙ্গ ৬২৪ হিজরির আলোচনায় এসেছে।

- **প্রথম ফতোয়াঃ**

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

“তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসন ব্যবস্থা কামনা করে! বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?” [সূরা মায়েদা :৫০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন:

ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها. وفيها كثير من الاحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكِّم سواه في قليل ولا كثير

“আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির নিন্দা করছেন যে আল্লাহর দৃঢ় বিধানকে ছেড়ে দেয়। অথচ তা সকল কল্যাণকে সমন্বিত করে, সকল ক্ষতিকারক বস্তুকে নিষিদ্ধ করে। আল্লাহর বিধান ছেড়ে দিয়ে সে ফিরে যায় এমন কিছু মতামত, রীতিনীতি ও প্রথার দিকে, যা প্রণয়ন করেছে মানুষেরাই। আল্লাহর শরীয়াতের সাথে যার নেই কোন সম্পর্ক।

যেমনটা করতো জাহিলী যুগের মানুষেরা। তারা তাদের চিন্তা প্রসূত মতামত থেকে প্রণীত জাহিলী ভ্রান্ত বিধান দ্বারা ফয়সালা প্রদান করতো। এবং যেমন তাতাররা তাদের ঐসব রাষ্ট্রীয় আইন কানুন দিয়ে বিচার ফয়সালা করছে, যা তারা গ্রহণ করেছে তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান থেকে। যে চেঙ্গিস খান তাদের জন্য **“ইয়াসিক”** নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে।

ইয়াসিক হলো ইসলামী, নাসরানি, ইহুদীসহ বিভিন্ন শরীয়তের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংবিধান। তাতে এমন অনেক বিধানও আছে, যা সে শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। অত:পর তা তার অনুসারিদের নিকট পরিণত হয়েছে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে। একে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করার উপর অগ্রাদিকার দেয়।

যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের । তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের দিকে ফিরে আসে, এবং কম হোক বেশি হোক কোন কিছুর ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছুকে বিচারকরূপে গ্রহণ না করে।”

[তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ড:৩, পৃ: ১৩১]

- **একটি লক্ষ্যনীয় বিষয়ঃ আইন প্রণেতা এবং তার বাস্তবায়নকারী উভয়ই কাফেরঃ**

ইবনে কাসীর রহ. যেসব তাতারীকে কাফের ফতোয়া দিয়েছিলেন তারা তাদের কুফরী সংবিধান ইয়াসিকের রচয়িতা ছিল না। ইয়াসিক রচনা করে ছিল তাতারীদের নেতা চেঙ্গিস খান, যে ৬২৪ হিজরিতে মারা যায়। আর ইবনে কাসীর রহ. ইন্তেকাল করেন ৭৭৪ হিজরিতে। তাঁর মাঝে এবং চেঙ্গিস খানের মাঝে দেড়শো বছরের ব্যবধান।

ইবনে কাসীর রহ. এর যামানার তাতারীরা কুফরী সংবিধান প্রণয়ন করেনি । পূর্বের সংবিধান অনুসরণ করে চলেছে মাত্র।

এ থেকে স্পষ্ট , কুফরী সংবিধানের প্রণেতারা যেমন কাফের, এর দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরাও তেমনি কাফের।

অতএব, আমাদের সমাজের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী যদি নিজেরা শরীয়ত বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন নাও করে তবুও পূর্বের কুফরী সংবিধান অনুসরণের কারণে তারা মুরতাদ।

যেমন, কুফর যারা আবিষ্কার করে আর যারা তাতে লিপ্ত হয় উভয়ই কাফের। বিদআত যারা আবিষ্কার করে আর যারা তার অনুসরণ করে উভয়ই বিদআতী। এখানে শাসকদের ক্ষেত্রেও তাই।

- **দ্বিতীয় ফতোয়াঃ**

'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' তে চেঙ্গিস খানের জীবনী আলোচনায় নমুনা স্বরুপ ইয়াসিকের কতগুলো শরীয়ত বিরোধী আইন উল্লেখ করার পর বলেন-

وفي كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين

"এই সবগুলোর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার বান্দা নবীগণ - আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম - এর উপর আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ শরীয়তের বিরোধিতা। যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ সুদৃঢ় শরীয়াতকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন রহিত শরীয়ত অনুযায়ী বিচারের জন্য যাবে সে কাফের হয়ে যাবে। তাহলে ঐ ব্যক্তির বিধান কী হতে পারে যে ইয়াসিক অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করে এবং তাকে শরীয়তের উপর অগ্রাধিকার দেয়? যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে মুসলমানদের ইজমা-ঐকমতে কাফের হয়ে যাবে।"

[আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খন্ড:১৩, পৃষ্ঠা:১৩৯]

- **নির্দেশনাঃ বর্তমান সংবিধান ইয়াসিকের চেয়েও নিকৃষ্টঃ**

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, তাতারদের ইয়াসিক নামক সংবিধানের চেয়ে বর্তমান সংবিধানগুলো আরো নিকৃষ্ট ও জঘন্য। কেননা ইয়াসিকের মাঝে তো অপরাধগুলোকে অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং তার শাস্তিও বিধান করা হয়েছে, যদিও তা ছিল কুরআন সুন্নাহর বিপরীত। কিন্তু আমাদের বর্তমান সংবিধানগুলো তো অপরাধগুলোকে অপরাধ বলেই আখ্যায়িত করে না বরং অনেক অপরাধকে ভাল কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করে। ইয়াসিকের অনুসারীদের বিধানই যদি এই হয় তাহলে তার চেয়ে নিকৃষ্ট সংবিধানের অনুসারীদের বিধান কী হবে ?

- **শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু-৭২৮হি.) এর ফতোয়াঃ**

যে সমস্ত ব্যক্তি মুসলমান ও তাতারদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধে তাতারদের পক্ষ গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে সাহায্য করেছিল - তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) নিম্নোক্ত ফতোয়া প্রদান করেন:

وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الامراء فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام ، وإذ كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين؟؟ (الفتاوى الكبرى)

"সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে যে কেউ তাতারদের পক্ষ নিবে, তাতারদের বিধান ও তার বিধান একই বলে গণ্য হবে। চেঙ্গিস খান ইসলামী শরীয়াত থেকে যে পরিমাণ দূরে সরে গেছে তাদের মাঝেও ঐ একই পরিমাণ ইরতিদাদ বিদ্যমান। যেখানে সালাফগণ যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারিদেরকে নামাজ, রোজা আদায় করা এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ না করা সত্ত্বেও মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাহলে ঐ ব্যক্তির বিধান কী হতে পারে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করে?"

[আল-ফাতাওয়াল কুবরা, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৩৩২]

***

❖ উসমানী খেলাফেতের পরাজয়ের পর কুফরী শাসনঃ

দ্বিতীয় বার মুসলিম বিশ্বে কুফরী শাসনের ফিতনা দেখা দেয় ১ম বিশ্ব যুদ্ধে উসমানী খেলাফতের পরাজয়ের পর। খেলাফতের পরাজয়ের পর কাফেররা বিশাল খেলাফতকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে একেক অংশে মুসলিম নামধারী একেক মুরতাদকে ক্ষমতায় বসায়। তারা আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকে। তখন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম শাসকদের এ কাজকে ইরতিদাদ এবং তাদেরকে মুরতাদ বলে ফতোয়া দেন।

এখানে আমি তাঁদের কয়েক জনের ফতোয়া উল্লেখ করবো।

১. শাইখুল ইসলাম মোস্তফা সবারী (রহঃ) এর ফতোয়াঃ

১ম বিশ্ব যুদ্ধে উসমানী খেলাফতের পরাজয়ের পর মুরতাদ কামাল আতাতুর্ক যখন ১৯২৪ সালে উসমানী খেলাফতের রাজধানী তুরস্ক থেকে ইসলামী শাসন দূর করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করে, তখন উসমানী খেলাফতের সর্বশেষ শাইখুল ইসলাম মোস্তফা সবারী (রহঃ) উক্ত কাজকে কুফর ও রিদ্দাহ বলে ফতোয়া প্রদান করেন এবং সেখান থেকে হিজরত করে মিশরে চলে আসেন।

তিনি এর বিরুদ্ধে কলম ধরে কুফর ও ইরতিদাদের নতুন এ রূপকে শরয়ী দলিল ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের মুসলমানদের সামনে স্পষ্ট করে তুলেন।

আমি এখানে তাঁর লেখা থেকে নির্বাচিত দু'টি অংশ তুলে ধরছি-

এক)

তিনি এটিকে ঈমানের সাথে সংঘার্ষিক সাব্যস্ত করেন:-

والحق أن ترويج فصل الدين عن الدولة سواء كان هذا الترويج من رجال الحكومة اوالكتاب والمفكرين في مصلحة الدولة والأمة لا يتفق مع الإيمان بأن الدين منزل من عند الله ؛ وأن أحكامه المذكورة في الكتاب والسنة أحكام الله المبلغة بواسطة رسوله ؛ وكل من أشار بمبدأ الفصل إلي -مستطبن للإلحاد ؛ او بليد جاهل بمعني فصل الدين عن الدولة ومغزاه :المجتمع ؛ فهو إما

"সত্য কথা হচ্ছে, (দ্বীন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহতে বিদ্যমান দ্বীনের বিধানগুলো রাসূলের মাধ্যমে অবতীর্ণ আল্লাহরই বিধান) এই বিশ্বাসের সাথে "রাষ্ট্র থেকে ধর্ম পৃথকীকরণ" একত্র হতে পারে না। চাই তা প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে করা হোক, অথবা দেশ ও জাতির কল্যাণ বিষয়ের লেখক ও বুদ্ধিজীবিদের পক্ষ থেকে হোক।

যে ব্যক্তিই সমাজকে রাষ্ট্র থেকে ধর্ম পৃর্থক করার পরামর্শ দেবে হয়তো সে গোপনে গোপনে নাস্তিকতা পোষণকারী অথবা নির্বোধ এবং ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথকীকরণের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ। "

[মাওকিফুল আকল, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা: ২৮০]

দুই)

রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে শর'য়ী বিধান পৃথককারীকে তিনি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত বলে ফতোয়া দেন:

فإذا خرج عن الإسلام من لا يقبل سلطة الدين عليه بالأمر والنهي وتدخله في أعماله حال كونه فردا من أفراد المسلمين ؛ فكيف لا يخرج من لا يقبل هذه السلطة وهذا التدخل ؛ بصفة أنه داخل في هيئة الحكومة؟

"যেখানে কোন মুসলমান তার সাধারণ সামাজিক জীবনে যদি তার উপর দ্বীনের এই কতৃত্বকে মেনে না নেয় যে, দ্বীন তাকে আদেশ ও নিষেধ প্রদান করবে এবং তার কার্যাবলীর মধ্যে দখল নেবে , তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়; তাহলে ঐ ব্যক্তি কিভাবে খারিজ না হবে, যে রাষ্ট্রীয় জীবনে এই কতৃত্ব এবং এই দখলদারিত্বকে মেনে না নেবে ?!"

[মাওকিফুল আকল খন্ড:৪, পৃষ্ঠা: ২৯৪]

২-৩. আহমদ শাকের রহ. ও তাঁর ভাই মাহমুদ শাকের রহ. এর ফতোয়াঃ

উসমানী খেলাফতের পতনের পর মানব রচিত সংবিধান যখন মিশরের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে পরিণত হয় তখন মিশরের সবচেয়ে বড় আলেম, মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ আল্লামা আহমাদ শাকের (রহঃ) ও তার ভাই মাহমূদ শাকের (রহঃ) এই বিধান রচনাকারীদেরকে কাফের ও মুরতাদ ফতোয়া প্রদান করেন।

আহমদ শাকের রহ. এর ফতোয়াঃ

আহমদ শাকের (রহঃ) গত শতাব্দীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। হাদীস শাস্ত্রে যার খিদমাত ও অবদান ভুলবার নয়। ফিক্বহে হানাফীতে তাঁর ছিল অগাধ পান্ডিত্য। তিনি জামেয়া আযহার থেকে ফিক্বহে হানাফীর উপর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সনদ লাভ করেন। ফিক্বহে হানাফী অনুযায়ী মিশরে প্রায় ২০ বছর ক্বাজী হিসেবে বিচার ফয়সালা করেন।

তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে এ সমস্ত শাসকদের কুফরির বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

যেমন তিনি বলেন:

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة.
.ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائناً من كان - في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. اهـ

"এ সমস্ত মানব রচিত আইন যে كفر بواح তথা সুস্পষ্ট কুফর তা সূর্যের মতো স্পষ্ট। এতে কোন ধরনের অস্পষ্টতা বা প্যাঁচ নেই। মুসলমান দাবীদার কোন ব্যক্তির জন্য এ সব বিধান অনুযায়ী আমল করা, সেগুলোর আনুগত্য করা বা এগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনই সুযোগ নেই, সে যেই হোক না কেন। এ ক্ষেত্রে তার কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না।"

[উমদাতুত তাফসীর, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:১৭৩-১৭৪]

তিনি আরো বলেন:

نري في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها، نقلت عن أوربة الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لايخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل دينه أويعاديه من حيث لايشعر، وهي في كثير من أحكامه أيضا توافق التشريع الإسلامي، أو لا تنافيه علي الأقل وإن العمل بها في بلادالمسلمين غير جائز، حتي في ما وافق التشريع الإسلامي، لأن من وضعها حين

وضعها لم ينظر إلي موافقته للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلي موافقته القوانين أوربة أو لمبادئها وقواعدها، وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه، فهو آثم مرتد بهذا، سواء أ وضع حكما موافقا للإسلام أومخالفا

(كلمة الحق 95-96)

“কিছু কিছু মুসলিম দেশে দেখতে পাচ্ছি পৌত্তলিক ও নাস্তিক্যবাদী ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত আইন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সেগুলো এমন আইন যা ইসলামের শাখাগত ও মৌলিক অনেক বিধানের গোড়ার সাথেই সাংঘর্ষিক। তাতে তো এমন কিছু বিধানও রয়েছে যা ইসলামকে নস্যাৎ ও ধ্বংস করে ফেলে। এ বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট। এ ব্যাপারে শুধু ঐ ব্যক্তিই দ্বিমত পোষণ করতে পারে যে নিজের সাথে প্রতারণা করছে এবং সে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। অথবা সে দ্বীনের বিরোধিতা করছে অথচ তা অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছে না।

হ্যাঁ, তার অনেক বিধান ইসলামি শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। অথবা অন্তত সাংঘর্ষিক নয়।

মুসলিম দেশগুলোতে এই সংবিধান কার্যকর করা কোনভাবেই বৈধ নয়। এমনকি সে বিধানগুলোও নয়, যেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা যে বা যারা এই সংবিধান রচনা করেছে তারা লক্ষ্য করেনি যে, এটা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখছে না’কি সাংঘর্ষিক হচ্ছে। বরং তারা লক্ষ্য করেছে, তা পশ্চিমাদের সংবিধানের সাথে অথবা তার মৌলিক দিকগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কি হচ্ছে না? এবং ওটাকেই মূল ভিত্তি রূপে গ্রহণ করছে।

অতএব সে এ কাজের দ্বারা পাপিষ্ঠ মুরতাদে পরিণত হবে। চাই সে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান রচনা করুক বা সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করুক ।”

[কালিমাতুল হক্ব : ৯৫-৯৬]

তিনি আরো বলেন:

ومن حكم بغيرما أنزل الله عامدا عارفا فهو كافر. ومن رضي عن ذلك وأقره فهو كافر, سواء أ حكم بما يسميه شريعة أهل الكتاب أم بما يسميه تشريعا وضعيا .فكله كفر و خروج من الملة, أعاذنا الله من ذلك

“যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জেনে শুনে আল্লাহর বিধান ব্যতিরেকে ভিন্ন বিধানে বিচার ফয়সালা করে সে কাফের। যে এ ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বা স্বীকৃতি প্রদান করে সেও কাফের। চাই সে এমন বিধান দ্বারা ফায়সালা করুক যাকে সে আহলে কিতাবের শরীয়াত বলে থাকে, কিংব এমন বিধান দ্বারা ফায়সালা করুক যাকে সে মানব রচিত বিধান বলে

থাকে। এর প্রতিটিই কুফরি যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।”

[দেখুন: শায়খের তাহকীককৃত মুসনাদে আহামাদ, ৭৭৪৭ নং হাদীসের প্রাসঙ্গিক আলোচনা]

আল্লামা মাহমূদ শাকের (রহঃ) এর ফতোয়াঃ

আল্লামা আহমদ শাকের (রহঃ) এর ভাই আল্লামা মাহমূদ শাকের (রহঃ) বলেন:

فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفرعلى حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لايشك أحد من أهل القبلة على اختلافه في تكفيرالقائل به والداعي إليه.)اهـ

“এ ধরনের কাজ (অর্থাৎ নতুনভাবে সংবিধান রচনা) আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা, তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রাহ্যতা প্রকাশ এবং মহান আল্লাহ তায়ালার বিধানের উপর কাফেরদের বিধানকে প্রাধান্য প্রদান। এ সকল কাজ কুফর। কোনো মুসলমান, চাই সে যে মতেই বিশ্বাসী হোক, এর প্রবক্তা এবং এর দিকে আহ্বানকারীর কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।”

[উমদাতুত তাফসীর, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:১৫৭]

৪. শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহঃ) এর ফতোয়াঃ

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সিরিয়ায় যখন কিছু ব্যক্তি সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে ধর্মীয় বিধানকে পৃথক করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে তখন সিরিয় কিছু আলেম শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহঃ) কে তাদের ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দেন।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে হক্বকে সাহায্য না করে যে ব্যক্তি নীরব ভূমিকা পালন করে তাকে মুরতাদের সহায়তাকারী বোবা শয়তান আখ্যা দেন।

কাউসারী (রহঃ) লিখেন:

إن هذه هي أدعى الدواهي وأعظم المصائب، يذوب لهولها قلب كلّ مؤمن صادق الإيمان، ولا سيّما في مثل بلاد الشام التي لها ماض مجيد في خدمة الإسلام، فالمسلم إذا طالب بمثل ذلك في سلامة عقله يجري عليه حكم الردة في بلد يكون فيه الإسلام نافذ الأحكام، وفي غيره يُهجر هذا المطالب هجرا كليًا فلا يكلم ولا يعامل في أمر أصلاً حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ويتوب وينيب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن دين الإسلام جامع لمصلحتي الدنيا والآخرة، ولأحكامهما

دلالة واضحة لا ارتياب فيها، فتكون محاولة فصل الدين من الدولة كفرا صارخًا منابذا لإعلاء كلمة الله، وعداءً موجها إلى الدين الإسلامي في صميمه،
ويكون هذا الطلب من هذا المطالب إقرار منه بالانبتار والانفصال فيلزمه بإقراره، فنعده عضوًا مبتورًا من جسم جماعة المسلمين وشخصًا منفصلاً عن عقيدة الإسلام، فلا تصح مناكحته ولا تحل ذبيحته لأنه ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب

“নিশ্চয়ই এটি চরম বিপর্যয়, কঠিন মুসিবত; যার ভয়াবহতায় সত্য ঈমানের অধিকারী প্রতিটি মুমিনের হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বিশেষ করে সিরিয়ার মত রাষ্ট্রে, যার অতীত ভরপুর রয়েছে ইসলামের নানা খেদমতে।

কোন মুসলমানের আকল সুস্থ থাকা সত্ত্বেও যদি সে এ ধরনের প্রয়াস চালায়, তাহলে যদি সেই অঞ্চলে ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়িত থাকে তবে তার উপর মুরতাদের বিধান জারি হবে।

আর যদি এমন এলাকা হয় যেখানে ইসলামী বিধান জারির সামর্থ্য নেই তাহলে এই কাজে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ বয়কট করতে হবে। তার সাথে কোন ধরনের কথা বা লেনদেন করা যাবে না। যতক্ষণ না জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে; আর সে তাওবা করে ফিরে আসে।

কুরআন ও সুন্নাহর নসগুলো স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, ইসলাম ধর্ম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ ও বিধি-বিধানের সমাহার। তাই রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট কুফর। আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার বিরোধিতা। দ্বীনে ইসলামের একেবারে গোড়ার সাথে দুশমনি।

উপরুক্ত কাজে ইচ্ছুক ব্যক্তির এই প্রয়াসই তার পক্ষ থেকে (দ্বীন থেকে) পৃথক হয়ে যাওয়া ও বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। তার স্বীকারোক্তির দ্বারাই এই হুকুম তার উপর বর্তাবে। ফলে আমরা তাকে মুসলিম উম্মাহর শরীর থেকে একটি কর্তিত অঙ্গ এবং ইসলামী বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি বলে গণ্য করব। তার সাথে বিবাহ বৈধ হবে না, তার জবেহকৃত পশুর গোশত হালাল হবে না। কেননা সে মুসলমানও নয়, আহলে কিতাবও নয়।”

এর পর কাউসারী (রহঃ) এই ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণ পেশ করেন। অতঃপর বলেন,

وأما الساكت من أهل الشأن عن تأييد الحق في مثل تلك الكارثة فإنما هو شيطان أخرس وردء لأهل الردة

"এই কঠিন বিপর্যয়ে শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যে সত্যকে সাহায্য না করে নীরবতা অবলম্বন করবে সে হলো বোবা শয়তান এবং মুরতাদদের সহায়ক"

[দেখুন: মাক্বালাতুল কাউসারীঃ হুকমু মুহাওলাতি ফাসলিদ দ্বীন, পৃষ্ঠা: ৩৩০/৩৩১, প্রকাশনা: আল-মাকতাবুত তাউফীকিয়্যাহ্]

৫. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম আলুশ শায়খ (রহঃ) এর ফতোয়াঃ

সউদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী বিশিষ্ট ফকীহ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম আলুশ শায়খ (রহঃ) নিম্নোক্ত ফতোয়া দেন,

لو قال من حكَّم القانون : "أنا أعتقد أنه باطل" فهذا باطل لا أثر له ، بل هو عزل للشرع ، كما لو قال أحد : "أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل."وأما إذا جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وأن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل

"মানব রচিত বিধানকে বিচারক হিসেবে গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি বলে: (আমি বিশ্বাস রাখি এটা বাতিল) তবুও তার এ কথা ধর্তব্য হবে না। বরং তার এই কাজ হচ্ছে শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান। যেমন, কোন মূর্তি পূজক যদি বলে: (আমি মূর্তি পূঁজা করি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এটা বাতিল।)

আর যদি শ্রেণিবিন্যাস করে সুশৃংখলভাবে আইন প্রণয়ন করে তবে তা কুফর। যদিও বলে, (আমরা ভুল করছি । শরীয়াতের বিধানই অধিক ইনসাফপূর্ণ।)"

[আল-ফাতাওয়া, খন্ড:১২, পৃষ্ঠা:২৮০]

৬. আল্লামা শানক্বিতী (রহঃ) এর ফতোয়াঃ

তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআনের অন্যতম তাফসীর গ্রন্থ **"আদওয়াউল বায়ান"** প্রণেতা প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা শানক্বিতী (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সম্পূর্ণ স্পষ্টরূপে এ সমস্ত শাসকদের হুকুম বর্ণনা করেছেন যে, তারা মুরতাদ।

আল্লাহ তায়ালার বাণী –

وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا

তিনি কাউকে নিজ বিধানের ক্ষেত্রে শরীক করেন না। [সূরা কাহাফ: ২৬]

এর ব্যাখ্যায় এ সমস্ত শাসকদের কুফরির ব্যাপারে একাধিক দলিল পেশ করার পর তিনি বলেন:

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم.

"(উপরোল্লিখিত) এ সমস্ত আসমানী দলিল-প্রমাণ দ্বারা পূর্ণরূপে স্পষ্ট যে, যারা ঐ প্রণীত কানূনের অনুসরণ করে যা শয়তান তার বন্ধুদের মাধ্যমে প্রণয়ন করেছে, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মাধ্যমে যে বিধান দিয়েছেন তার বিপরীত, তাদের কাফের ও মুশরেক হওয়ার ব্যাপারে শুধু সে ব্যক্তিই সন্দেহ করতে পারে, আল্লাহ যার অর্ন্তদৃষ্টি নিভিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরই মতো তাকেও ওহীর নূর থেকে অন্ধ করে দিয়েছেন।"

[তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২৫৯]

এ ছাড়াও তিনি উক্ত তাফসীর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে অনেক দলিল পেশ করেন যার দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ সমস্ত শাসক ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ হয়ে গেছে। যা হোক, এখানে বিস্তারিত আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। নমুনাস্বরুপ নির্ভরযোগ্য ওলামাদের কয়েকজনের ফতোয়া উল্লেখ করা হল।

***

এরপর আরোও কয়েকটা জরুরী বিষয় আত্নস্থ করে নেয়া চাই।

১. ইসলামী আইন চালু না, থাকা আর কুফরী আইন চালু থাকা এক নয়ঃ

একটি বিষয় খুব ভালভাবে খেয়াল রাখা চাই, ইসলামী শাসন পরিপূর্ণ জারি না থাকা আর কুফরী শাসন জারি থাকা এক নয়। বরং এ দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টো বিষয়। দ্বিতীয়টি কুফর, কিন্তু প্রথমটি সর্বাবস্থায় কুফর নয়।

রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ইসলামী শরীয়তের উপর হওয়ার পর এবং এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধানের সকল আইন ইসলামী হওয়ার পর যদি শাসকের গাফলতির কারণে , কিংবা শাসক জালেম বা ফাসেক হওয়ার কারণে রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলামী পরিবেশ বজায় না থাকে; বিচারকরা কখনোও কখনোও শরীয়ত পরিপন্থি ফায়সালা দিয়ে ফেলে, তাহলে শাসক বা বিচারক কেউই কাফের হয়ে যায় না, যদি তাদের মাঝে অন্য কোন কুফর না পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই যদি কুফরী হয়, যেখানে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত অনুযায়ী বিচার না করে বরং মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে বিচার করা হয়- তাহলে কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী এসব শাসক কাফের ও মুরতাদ। যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, নামাজ-রোযা ও অন্যান্য হুকুম আহকাম পালন করে।

এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরাম সকলে একমত।

যেমন, নামাজ না পড়া, আর গাইরুল্লার জন্য নামাজ পড়া এক নয়। নামাজ না পড়া সর্বাবস্থায় কুফর নয়। বেনামাজী সর্বাবস্থায় কাফের নয়। কিন্তু গাইরুল্লার জন্য নামাজ পড়া সর্বাবস্থায় কুফর এবং এ ধরণের ব্যক্তি সর্বাবস্থায় কাফের। যদিও সে নিজেকে মুসলমান দাবি করে।

কিন্তু অনেকে এ দুটো বিষয়কে এক করে ফেলেন।ফলে নিজেও মারাত্নক বিভ্রান্তির শিকার হন, অন্যকেও বিভ্রান্ত করেন।

২. খেলাফত যামানা আর বর্তমান যামানা এক নয়ঃ

ইসলামী খেলাফত যতদিন কায়েম ছিল ততদিন শাসন ব্যবস্থা ইসলামী ছিল। তবে শাসকরা কম বেশ জুলুম করতেন। বিচারকরা কখনোও কখনোও শরীয়ত পরিপন্থি ফায়সালা দিয়ে দিতেন। কিন্তু এটা কুফর নয়। আইম্মায়ে কেরাম জালেম শাসকদের বিরোদ্ধে জিহাদ তো করেছেন, কিন্তু তাদেরকে কাফের ফতোয়া দেননি।

পক্ষান্তরে বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই কুফরী । সেখানে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত অনুযায়ী বিচার না করে বরং মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে বিচার করা হয়। আর কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকরা কাফের ও মুরতাদ। যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, নামাজ-রোযা ও অন্যান্য হুকুম আহকাম পালন করে।

কিন্তু অনেকে এ দুই যামানাকে এক করে ফেলেন। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে খেলাফত যামানার শাসকদের মতো জালেম মুসলমান মনে করেন। ফলে নিজেও মারাত্নক বিভ্রান্তির শিকার হন, অন্যকেও বিভ্রান্ত করেন।

৩. 'দারুল মুসলিমীন' না বলে 'দারুল ইসলাম' কেন বলা হল ?

সমস্ত ফিকহের কিতাবে বলা হয়, 'দারুল ইসলাম'। 'দারুল মুসলিমীন' বলা হয় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে ইসলামের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়, মুসলমানদের দিকে নয়। এ থেকে বোঝে আসে, কোন রাষ্ট্র 'দারুল ইসলাম' হওয়ার জন্য তাতে মুসলমান থাকা জরুরী নয়, কিন্তু ইসলাম থাকা জরুরী। আবার ইসলাম পরাজিত হয়ে থাকলে হবে না। বিজয়ী বেশে থাকা শর্ত। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. তাঁর ফতোয়ায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

অতএব, যেখানে ইসলাম বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। যদিও তাতে মুসলমান না থাকে। যেমন, দারুল ইসলামের ঐ অংশ যেখানে যিম্মি কাফেররা বসবাস করে।

আর যেখানে ইসলাম বিজয়ী নয় তা দারুল ইসলাম নয়। যদিও তাতে অনেক মুসলমান থাকে। যেমন, ঐ দারুল হরব যেখানে মুসলমানরা কাফেরদের অনুমতি নিয়ে বা তাদের গাফলতির সুযোগে বসবাস করে।

৪. রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া অসম্ভবঃ

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. অত্যন্ত জোর দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছেন- কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় এবং সাংবিধানিকভাবে কুফরী বিধান জারি থাকলেও এবং মুসলমান জনসাধারণ ইসলামী শাসন জারি করতে না পারলেও রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া সম্ভব।

কিন্তু আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য দেখলে এই ধারণা সঠিক মনে হয় না। কেননা কোন রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র না কুফরী রাষ্ট্র এবং তা মুসলমানদের হাতে না কাফেরদের হাতে তা বুঝা যাবে তাতে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় বিধান থেকে। ইসলামী বিধান চললে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম, আর কুফরী বিধান চললে রাষ্ট্র দারুল কুফর। রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র কখনো ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারে না এবং তা মুসলমানদের হাতে থাকতে পারে না।

কেননা, কোন মুসলমান শাসক রাষ্ট্রীয়ভাবে কুফরী আইন জারি করে দিলে সে আর মুসলমান থাকে না। মুরতাদ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে নমুনাস্বরূপ নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি ফতোয়া এইমাত্র উল্লেখ করেছি।

মুরতাদ শাসককে হটিয়ে ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসক নির্বাচন করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। যদি উক্ত মুরতাদ শাসক ইসলামী শাসন রহিত করে রাষ্ট্রে কুফরী শাসন জারি করে দেয় এবং মুসলমানরা তাকে হটিয়ে ইসলামী শাসন জারি করতে না পারে তাহলে

রাষ্ট্র আর দারুল ইসলাম থাকে না, দারুল কুফর হয়ে যায়। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. তাঁর ফতোয়ায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছে।
অতএব, এদিক থেকে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে কুফরী বিধান জারি থাকা রাষ্ট্র দারুল হরব হওয়া এবং তা কাফেরদের হাতে থাকার নিদর্শন।

শাসকগোষ্ঠীর মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি যদি আমরা আপাতত নাও ধরি তবুও আইম্মায়ে কেরামের স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়, যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী তা দারুল হরব। আইম্মায়ে কেরামের অনেকেই সুস্পষ্ট বলে গেছেন, দারুল হরব ঐ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান চলে। অতএব, রাষ্ট্রীয়ভাবে কুফরী বিধান চলার অর্থই রাষ্ট্র দারুল কুফর।
উল্লেখ্য যে, আইম্মায়ে কেরামের কারো কারো বক্তব্যে এসেছে, দারুল হরব ঐ রাষ্ট্র যেখানে কাফেরদের শাসন চলে; আবার কারো কারো বক্তব্যে এসেছে, দারুল হরব ঐ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান চলে। আসলে এ দুইয়ের মাঝে কোন তাআরুজ বা বিরোধ নেই। কারণ মুসলিম শাসক যখন আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাদ দিয়ে কুফরী বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তখন আর সে মুসলমান থাকে না। মুরতাদ হয়ে যায়। এরপর যখন তাকে হটিয়ে ইসলামী শাসন কায়েম না করা যায় তখন রাষ্ট্র দারুল হরব হয়ে যায়। অতএব, রাষ্ট্রে কুফরী বিধান চলার অর্থই হচ্ছে তা কাফের বা মুরতাদদের দখলে আছে। কাজেই রাষ্ট্রে কুফরী বিধান চলার যে অর্থ, রাষ্ট্র কাফেরদের হাতে থাকারও একই অর্থ। এ কারণেই কেউ বলেছেন, দারুল হরব ঐ রাষ্ট্র যেখানে কাফেরদের শাসন চলে, আবার কেউ বলেছেন, দারুল হরব ঐ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান চলে। মূলত উভয় কথার উদ্দেশ্য একই।

এবার আসুন আইম্মায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য লক্ষ্য করিঃ

- শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০ হি.) বলেন,

فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين، فكانت دار حرب. وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوى فيه للمسلمين.

[প্রত্যেক ঐ ভূখন্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা কাফেরদের হাতে। কাজেই তা দারুল হরব। আর প্রত্যেক ঐ ভূখন্ড যেখানে ইসলামী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে।]

(আল-মাবসূতঃ ১০/১১৪)

- আল্লামা কাসানী রহ.(মৃত্যুঃ ৫৮৭ হি.) বলেন,

أَنَّ قَوْلَنَا دَارُ الْإِسْلَامِ وَدَارُ الْكُفْرِ إضَافَةُ دَارٍ إلَى الْإِسْلَامِ وَإِلَى الْكُفْرِ، وَإِنَّمَا تُضَافُ الدَّارُ إلَى الْإِسْلَامِ أَوْ إلَى الْكُفْرِ لِظُهُورِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْكُفْرِ فِيهَا... فَإِذَا ظَهَرَ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِي دَارٍ فَقَدْ صَارَتْ دَارَ كُفْرٍ.

[আমরা যে বলি, ‘দারুল ইসলাম’, ‘দারুল কুফর’ এর অর্থ: রাষ্ট্রকে ইসলাম ও কুফরের দিকে সম্বন্ধিত করা। রাষ্ট্রকে তখনই ইসলামের দিকে বা কুফরের দিকে সম্বন্ধিত করা হবে যখন তাতে ইসলাম বা কুফর বিজয়ী থাকবে।... কাজেই যখন কোন রাষ্ট্রে কুফরী বিধান বিজয়ী হয়ে যাবে, তখন তা দারুল কুফর হয়ে যাবে।]

(বাদায়িউস সানায়ী’: ৬/১১২)

- কাজী আবু ইয়ালা হাম্বলী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৫৮ হি.) বলেন,

وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر: فهي دار إسلام، و كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر.

[প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে ইসলামী বিধান বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। আর প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী তা দারুল কুফর।]

(আল-মু’তামাদ ফিল উসূলঃ ২৭৬)

- ইমাম মারদাবী রহ. (মৃত্যু: ৮৮৫হি.) বলেন,

ودار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر

[দারুল হরব ঐ ভূখন্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী।]

[আল-ইনসাফঃ৪/১২১]

- ইবনু মুফলীহ আল-হাম্বলী রহ. (মৃত্যু: ৭৬৩হি.)- যিনি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর শাগরেদ - বলেন,

فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر، ولا دار لغيرهما

[প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানদের আহকাম বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। আর যদি তাতে কাফেরদের আহকাম বিজয়ী হয় তাহলে তা দারুল কুফর।এই দুই প্রকার রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যকোন রাষ্ট্র নেই।]

[আল-আদাবুশ শরঈয়্যাহঃ ১/২১২]

- **'আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ্ আল-কুয়েতিয়্যাহ'** তে দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে-

دار الإسلام هي: كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة.اهـ

[দারুল ইসলাম প্রত্যেক এমন ভূখন্ড যেখানে ইসলামী বিধান বিজয়ী রয়েছে।]

دار الحرب هي: كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة.اهـ

[দারুল হরব প্রত্যেক এমন ভূখন্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী রয়েছে।]

['আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ্ আল-কুয়েতিয়্যাহ': ২০/২০১, হরফ: দাল]

অতএব, রাষ্ট্রীয় আইন কুফরী হবে কিন্তু রাষ্ট্র হবে ইসলামী - এটা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র অবশ্যই দারুল কুফর এবং তা কাফেরদের হাতে। চাই আসলী কাফের হোক, বা মুরতাদ কাফের হোক।

৫. 'হয়তো দারুল' ইসলাম নতুবা 'দারুল হরব'; মাঝামাঝি কোন সূরত নেইঃ

বর্তমান কুফরী আইন দ্বারা শাসিত গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে অনেকে দারুল আমান বলে থাকেন। আবার কেউ কেউ দারুল মুসলিমীনও বলেন।

কিন্তু দলীলের আলোকে তাদের এই বক্তব্য সহীহ বলে ধরা যায় না।কারণ-

- রাষ্ট্র হয়তো 'দারুল ইসলাম' নতুবা 'দারুল হরব'। মাঝামাঝি কোন সূরত নেই। যা

দারুল ইসলাম নয় তা দারুল হরব। ফুকাহায়ে কেরাম রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম ও দারুল হরব ব্যতীত তৃতীয় কোন প্রকারে ভাগ করেননি। কোন মাজহাবের ফিকহের কোন কিতাবে দারুল আমান বা দারুল মুসলিমীন নামে এমন কোন তৃতীয় প্রকার পাওয়া যায় না যা দারুল ইসলামও নয় আবার দারুল হরবও নয়। অতএব বলা যায়, দারুল আমান বা দারুল মুসলিমীন নামক পরিভাষা যা বর্তমানে অনেকে ব্যবহার করছেন তা নব আবিস্কৃত এবং ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা-ঐক্যমতের পরিপন্থি ।

- একটু পূর্বে আলোচনা করে এসেছি, রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া অসম্ভব। বরং যেখানে কুফরী বিধান চালু থাকবে তা দারুল হরব। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এ ধরণের রাষ্ট্রকে তৃতীয় কোন নাম দারুল আমান বা দারুল মুসলিমীন দেয়া যাবে না। বরং দারুল হরব বলতে হবে।

- **দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের মাঝামাঝি কোন রাষ্ট্র আছে বলে মনে করা ক্বদরিয়্যাদের আকিদা**। ক্বদরিয়্যাদের একটা ভ্রান্ত আকিদা হলো, কবীরা গুনাহকারীরা মুসলমানও নয়, কাফেরও নয়; বরং তারা ঈমানদার ও কাফেরের মাঝিমাঝি এক স্তরের মানুষ। কিন্তু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, মানুষ দুই প্রকারইঃ হয়তো ঈমানদার, নয়তো কাফের। মাঝামাঝি কোন প্রকার নেই।

ক্বদরিয়্যারা মানুষের ক্ষেত্রে যেমন এই ভ্রান্ত আাকিদা রাখে যে, ঈমানদার ও কাফেরের মাঝামাঝি এক প্রকার মানুষ রয়েছে, তদ্রুপ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এই ভ্রান্ত আকিদা রাখে যে, দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের মাঝামাঝি এক প্রকার রাষ্ট্র রয়েছে যাকে তারা 'দারুল ফিসক' তথা 'ফাসেকি রাষ্ট্র' নাম দেয়।

ফকীহে বাগদাদ কাজী আবু ই'য়ালা হাম্বলী রহ. (মৃত্যু: ৪৫৮হি.) বলেন-

وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر فهي دار إسلام، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر ، خلافا للقدرية في قولهم: إن كلا دار كانت الغلبة فيها للفساق دون المسلمين ولا الكفار: فإنها ليست بدار كفر ولا دار إسلام ، بل هي دار فسق. وهذا بناء على أصلهم فى القول بالمنزلة بين منزلتين ... ولايجوز كون مكلف ليس بمؤمن ولا كافرو، كذلك الدار أيضا لا يخلو من أن تكون داركفر أو دار إسلام.اهـ

[প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে ইসলামী বিধান বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। আর প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী তা দারুল কুফর। ক্বদরিয়্যারা এর বিপরীত মত পোষণ করে থাকে। তারা বলে, প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানরাও নয়, কাফেররাও নয় বরং ফাসেকরা বিজয়ী তা দারুল কুফরও নয়, দারুল ইসলামও নয়। বরং তা 'দারুল ফিসক'। তাদের এ আকিদা তাদের 'মানযিলাতুন বাইনাল মানযিলতাইন' – দুই স্তরের মাঝামাঝি স্তর – মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।... কোন মুকাল্লাফ ব্যক্তি – আকেল বালেগ পুরুষ বা মহিলা - মুমিনও হবে না, কাফেরও হবে না এটা যেমন অসম্ভব, রাষ্ট্রও তেমনি দারুল কুফর বা দারুল ইসলামের কোন একটা না হয়ে পারে না।]

(আল-মু'তামাদ ফিল উসূলঃ ২৭৬)

- যারা কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকদেরকে মুসলমান মনে করে তারা যখন এসব রাষ্ট্রকে দারুল আমান বলেন তখন বিষয়টা বড়ই আশ্চর্য্য লাগে। কারণ তারা দারুল আমানের সংজ্ঞা, উদাহরণ, দৃষ্টান্ত সবকিছু দেন নবীযুগের হাবশা দিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যখনকার হাবশাকে দারুল আমান বলা হচ্ছে তখনকার হাবশার শাসক মুসলমান ছিল না কাফের ছিল ?! সে হাবশা তখন মুসলমানদের হাতে ছিল না কাফেরদের হাতে ?! যদি তখন সেখানকার শাসক কাফের হয়ে থাকে, যদি তা কাফেরদের হাতে থেকে থাকে তাহলে তো তা দারুল হরব। হ্যাঁ, যেখানে সেখানে মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে দ্বীন পালন করতে পারতো এ কারণে তাকে দারুল আমান বলা হয়েছে। অতেএব, বিশেষ পরিস্থিতিতে তখনকার মক্কা যা তখন দারুল খওফ তথা ভীতিসংকুল রাষ্ট্র ছিল তার তুলনায় হাবশাকে দারুল আমান (নিরাপদ রাষ্ট্র) বলা হয়েছে। অতএব, দারুল আমান মূলত দারুল হরবই।অতএব, যারা এসব শাসককে মুসলমান মনে করে এবং এসব রাষ্ট্রকে দারুল হরব মনে করে না তারা এসব রাষ্ট্রকে দারু আমান বলা বড়ই আশ্চর্য্য জনক।
- কেউ হয়তো বলতে পারেন, আইম্মায়ে কেরামের যামানায় বর্তমানের মত কুফরী

শাসন ছিল না, ফলে তাঁরা শুধু দারুল ইসলাম আর দারুল কুফর এ দু'ভাগেই ভাগ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান কুফরী শাসনের যামানায় তৃতীয় আরেকিটি প্রকারের প্রয়োজন।

উত্তরে বলবো-

কুফরী শাসন ছিল না কথাটা ঠিক নয়। তাতারীদের কথা আমরা আলোচনা করে এসেছি। তাদের শাসন ব্যবস্থা কুফরী ছিল। যার ফলে আইম্মায়ে কেরাম তাদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের বিরোদ্ধে কিতালকে ফরয বলে ঘোষণা দিয়েছেন। নিজেরাও সশস্ত্রভাবে তাদের বিরোদ্ধে কিতাল করেছেন।

আর রাষ্ট্র মুরতাদদের হাতে চলে যাওয়ার পর তা যে দারুল হরব তা আর ফতোয়ার অপেক্ষায় থাকে না।

বর্তমান কুফরী শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলো কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব এই প্রশ্ন যেমন হচ্ছে, তাতারীদের দখলকৃত তখনকার রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারেও এই প্রশ্ন হয়েছিল যে, সেগুলো কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব? তখন স্পষ্টভাবে ফতোয়া দেয়া হয়েছে, এসব রাষ্ট্র দারুল হরব।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু: ৭২৮হি.) – যিনি তাতারী মুরতাদদের বিরোদ্ধে জিহাদে জীবন ব্যয় করেছেন - তিনি একটু ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। তাতারীদের দখলকৃত **'মারিদীন'** – যা বর্তমানে তুরস্কে অবস্থিত – এর ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তা কি দারুল হরব না দারুল ইসলাম? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ অর্থে দারুল ইসলামও নয়, আবার দারুল হরবও নয়; বরং তা 'দারে মুরাক্কাবাহ্' তথা দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের সমন্বিত একটা রূপ।

ফতোয়াটি তাঁর ভাষায় নিম্নরূপঃ

وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام , لكون جندها مسلمين , ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه.

[আর তা দারুল হরব না'কি দারুল ইসলাম - তো এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তা 'দারে মুরাক্কাবাহ্'। যাতে উভয় দিকই বিদ্যমান। দারুল ইসলামের সমপর্যায়েরও নয় যেখানকার সৈনিকগণ মুসলমান হওয়ার কারণে তাতে ইসলামী বিধান চলছে; আবার দারুল হরবের মতোও নয় যেখানকার অধিবাসীরা কাফের। বরং তা তৃতীয় একটি প্রকার। সেখানকার মুসলমানদের সাথে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী মুআমালা করা হবে, আর ইসলামী শরীয়ত থেকে যারা খারিজ হয়ে গেছে তাদের বিরোদ্ধে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী কিতাল করা হবে।]

(মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৪০-২৪১)

কিন্তু শাইখুল ইসলামের এই তৃতীয় প্রকার গ্রহণযোগ্য হয়নি। কেননা, তা পূর্ববর্তী আইম্মায়ে কেরামের ইজমা-ঐক্যমতের বিপরীত। এ কারণে তাঁর এ মত 'তাফাররুদ' তথা 'ইজমা পরিপন্থি বিচ্ছিন্ন মত' বলে বিবেচিত হয়েছে। স্বয়ং তাঁর শাগরেদ ইবনু মুফলিহ রহ. (মৃত্যু: ৭৬৩ হি.) এ মতকে পূর্বসূরি আইম্মায়ে কেরামের বিপরীত বিচ্ছিন্ন মত বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনু মুফলিহ রহ. বলেন-

فصل في تحقيق دار الإسلام و دار الحرب

فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر، ولا دار لغيرهما ، وقال الشيخ تقي الدين، وسئل عن ماردين ... والأول هو الذي ذكره القاضي و الأصحاب.اهـ

['দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হরব' এর বিশ্লেষণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানদের আহকাম বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। আর যদি তাতে কাফেরদের আহকাম বিজয়ী হয় তাহলে তা দারুল কুফর। এই দুই প্রকার রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যকোন রাষ্ট্র নেই। শায়খ তাকী উদ্দীন – ইবনে তাইমিয়া রহ. – কে **'মারিদীন'** সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন – এরপর তিনি ইবনে তাইমিয়া রহ. এর পূর্বোক্ত ফতোয়াটি উল্লেখ করেন। তারপর বলেন: তবে কাজী – আবু ই'য়ালা রহ. (মৃত্যু: ৪৫৮হি.) যার বক্তব্য আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি – এবং মাজহাবের অন্যান্য ইমামগণ প্রথমটিই উল্লেখ করেছেন।]

[আল-আদাবুশ শরঈয়্যাহঃ ১/২১২]

এখানে লক্ষ্যনীয় যে,

والأول هو الذي ذكره القاضي و الأصحاب.اهـ

[কাজী – আবু ই'য়ালা - এবং মাজহাবের অন্যান্য ইমামগণ প্রথমটিই উল্লেখ করেছেন।]

এই বাক্যটিতে আরবি ভাষা অনুযায়ী তিনটা তা'কিদ ব্যবহার করা হয়েছেঃ

১. মুবতাদা (সাবজেক্ট-উদ্দেশ্য) ও খবর (অবজেক্ট-বিধেয়) উভয়কে মা'রেফা আনা হয়েছে।

২. যমীরে হসর (সীমাবদ্ধতা নির্দেশক সর্বনাম) هو আনা হয়েছে, যা বুঝায় খবরটি মুবতাদার মাঝে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ কাজী সাহেব এবং মাজহাবের অন্যান্য ইমামগণ রাষ্ট্রের প্রকার দু'টিই উল্লেখ করেছেনে, তৃতীয় কোন প্রকার উল্লেখ করা হয়নি।

৩. জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ্ (বিশেষ্যবাচক বাক্য) আনা হয়েছে।

যারা ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাবাদির সাথে সম্পর্ক রাখেন তাদের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, এ ধরণের তাকিদপূর্ণ বাক্য মাজহাবের সর্বসম্মত ও মুফতা বিহি মতটি (যার উপর ফতোয়া দেয়া হয়) বুঝানোর জন্য এবং তার বিপরীত মতটিকে 'যয়ীফ' (দুর্বল) এবং 'তাফাররুদ' (বিচ্ছিন্ন মত) বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

অর্থাৎ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর এ মতটি মাজহাবের আইম্মায়ে কেরামের ইজমা-ঐক্যমতের বিপরীত দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন একটি মত। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

অতএব, রাষ্ট্রের প্রকার দু'টিই রয়ে গেল। হয়তো দারুল ইসলাম, নতুবা দারুল হরব। তৃতীয় কোন প্রকার নেই।

অধিকন্তু যদি শাইখুল ইসলামের এ মত গ্রহণযোগ্যও হত তবুও তা দারুল আমানের প্রবক্তাদের পক্ষে দলীল হতো না। কারণ:

- শাইখুল ইসলামের ফতোয়াতে দারুল আমান বলে কিছু নেই।
- শাইখুল ইসলাম তাঁর ফতোয়াতে তাতারীদের হুকুমতের বিরোদ্ধে কিতাল করার ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে যারা কুফরী আইন দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রগুলোকে দারুল আমান বলতে চান তারা এর দ্বারা বুঝাতে চান: যেহেতু সেগুলো দারুল আমান কাজেই সেগুলোর হুকুমতের বিরোদ্ধে কিতাল করা যাবে না। কিন্তু শাইখুল ইসলাম উল্টো কিতাল করার ফতোয়া দিয়েছেন। কাজেই শাইখুল ইসলামের ফতোয়া দারুল আমানওলাদের জন্য সুবিধাজনক নয়।

***

❖ তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর বক্তব্যের পর্যালোচনাঃ

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. **"ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত"** নামক কিতাবে কুফরী আইন দ্বারা শাসিত বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে 'দারুল ইসলাম' তথা 'ইসলামী রাষ্ট্র' দাবি করেছেন।

পর্যালোচনায় যাওয়ার আগে **"ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত"** থেকে তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর বক্তব্যটি তুলে ধরছি।

তিনি বলেন –

((پانچوا باب:

دفاع اور امور خارجہ

اس باب کا موضوع یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں دوسرے ملکوں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیئے پہلے یہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فقہ می دنیا کے ملکوں کے لیئے جو دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ایک دار الاسلام اور دوسرے دار الحرب یا دار الکفران دو اصطلحات کا مطلب کیا ہے؟

دار الاسلام اور دار الحرب

"دار الاسلام" سے مراد وہ ملک ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں ہو، اور اس پر انکا مکمل تسلط اس طرح قائم ہو کہ وہاں انہی کے احکام جاری اور نافذ ہوتے ہوں- چنانچہ علامہ سرخسی رحمۃاللہ علیہ دار الاسلام کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں:

"فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين"

یعنی: "دار الاسلام اس جگہ کا نام ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں ہو-"

(شرح السیر الکبیر باب 127 ج4 ص86)

اور جامع الرموز میں "الکافی" کے حوالے سے اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:

"دار الاسلام ما يجري فيه حكم امام المسلمين و كانوا فيه آمنين."

یعنی: دار الاسلام وہ ہے جس میں مسلمانوں کے امام (سربراہ) کا حکم چلتا ہو اور مسلمان اس می امن سے رہتے ہوں-"

(جامع الرموز ج4 ص556)

اگرچہ مسلمانوں کے تسلط میں ہونے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیئے کہ اس ملک میں تمام احکام اسلامی شریعت کے مطابق جاری ہوں، لیکن اگر مسلمان حکمرانوں کی غفلت سے اس میں شریعت کا مکمل نفاذ نہ ہو، تب بھی اگر اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، تو اسے دارالاسلام ہی کہا جائے گا-

جامع الرموز کی مذکورہ بالا عبارت میں جو کہا گیا ہے کہ اس ملک میں "مسلمانوں کے امام کا حکم چلتا ہو" اس سے بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا ہے کہ یہاں حکم سے مراد تمام احکام شریعت ہیں، لہٰذا اگر مسلمانوں کے زیر تسلط کسی ملک میں شریعت کے تمام احکام نافذ نہ ہوں تو اسے دار الاسلام نہیں کہا جا سکتا- لیکن یہ بات درست نہیں ہے- در حقیقت کسی ملک کے دار الاسلام قرار پانے کے لیئے اصل بات یہ ہے کہ اس پر مکمل اقتدار مسلمانوں کو حاصل ہو، اور انہیں اپنے احکام جاری کرنے کی مکمل قدرت حاصل ہو- پھر اگر وہ اپنی غفلت یا کوتاہی سے اسلام کے تمام احکام جاری نہ کریں تو یہ انکے لیئے شدید گناہ ہے، اور ان پر واجب ہے کہ تمام احکام شریعت کو نافذ کریں، لیکن انکی اس مجرمانہ غفلت کی وجہ س ملک دار الاسلام کی تعریف سے خارج نہیں ہوتا- اوپر آپ نے دیکھا کہ علامہ سرخسی رحمۃاللہ علیہ نے دار الاسلام کی تعریف میں صرف یہ بات ذکر فرمائی کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہو، اور اسی بات کو جامع الرموز کی عبارت میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے احکام چلتا ہو، یعنی اس کے احکام نافذ ہوتے ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ احکام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں- چونکہ اس دور میں اس بات کا تصور مشکل تھا کہ کوئی ملک مسلمانوں کے تسلط میں ہونے کے باوجود اپنے باشندوں پر اسلامی احکام نافذ نہ کرے، اس لیئے اس دور میں یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا کہ اگر مسلمانوں کے زیر اقتدار کسی ملک میں شریعت مکمل طور پر نافذ نہ ہو تو اسے دار الاسلام کہا جائیگا یا نہیں؟ بلکہ صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ دار الاسلام وہ ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں ہو، اور اس میں انہی کا حکم چلتا ہو- لیکن بعد کے زمانوں میں مسلمان حکمرانوں کی غفلت سے ایسی صورت حال پیش آئی کہ کوئی ملک مسلمانوں کے زیر اقتدار بھی ہے، اور اس می شریعت کے احکام پوری طرح نافذ نہیں ہیں، تو بعد کے فقہائے کرام نے اس کی صراحت بھی فرمادی- چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃاللہ علیہ فرماتے ہیں:

" وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلُّها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم و بعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، و لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها."

یعنی: " اس سے یہ بات ظاہر ہو گئ کہ شام میں جو جبل تیم اللہ کا علاقہ ہے جسکا نام جبل الدروز بھی ہے، وہ اور اسکے تابع جو شہر ہیں، وہ سب دار الاسلام ہیں، کیونکہ اگرچہ ان علاقوں میں عیسائی اور دورزی حکام موجود ہیں، اور انکے قاضی بھی ہیں جو اپنے دین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو علانیہ اسلام اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتیں ہیں، لیکن وہ ہمار حکام کے ماتحت ہیں، اور اسلامی ممالک ہر طرف سے انکو گھیرے ہوے ہیں، اور اگر ولی الامر ان پر ہمارے احکام نافذ کرنا چھاہے تو نافذ کر سکتا ہے-"

(ردالمحتار، کتاب الجہاد، فصل فی استئمان الکافر، قبیل باب العشر والخراج ج12 ص660 طبع جدید)

اس سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ کسی ملک کے دار الاسلام ہونے کے لیئے اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اقتدار اور قبضہ مکمل ہے یا نہیں؟ اگر اقتدار مکمل ہے تو اس ملک کو دار الاسلام کہا جائے گا، اور اس پر دار الاسلام ہی کے احکام جاری ہونگے، اگرچہ مسلمان حکمرانوں کی غفلت سے وہاں شریعت کا مکمل نفاذ نہ ہو سکا ہو-))

[পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র নীতি

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো – ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কী ধরণের সম্পর্ক রাখতে পারবে?

এই মাসআলা বুঝার জন্য প্রথমে ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে 'দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হরব' বা 'দারুল কুফর' নামে যে দুটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তার দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা আলোচনা করে নেয়া মুনাসিব-উপযোগী মনে হচ্ছে।

'দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হরব'

দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ রাষ্ট্র যা মুসলানদের কব্জায় রয়েছে এবং তাতে তাদের এমন পরিপূর্ণ দখলদারিত্ব কায়েম রয়েছে যে, তাতে তাদের আহকাম কার্যকরীভাবে চলে। যেমন আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন,

فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين

"'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে।"

(শরহুস সিয়ারীল কাবীর: পরিচ্ছেদ-১২৭, খন্ড-4, পৃষ্ঠা-৮৬)

'জামিউর রুমুজ' এ **'আল-কাফি'** এর বরাত দিয়ে এর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে,

دار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين و كانوا فيه آمنين

"'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর শাসন চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে।"

(জামিউর রুমুজ:খন্ড-4, পৃষ্ঠা-৫৫৬)

যদিও মুসলমানদের হাতে থাকার ফল এই হওয়ার কথা ছিল যে, উক্ত রাষ্ট্রে সকল আইন ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক চলবে, কিন্তু মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যদি পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি নাও থাকে, তবুও যদি ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকে তাহলে তাকে দারুল ইসলামই বলা হবে।

জামিউর রুমুজের উপরোক্ত বক্তব্যে যা বলা হয়েছে, "ঐ ভূখন্ডে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর শাসন চলে" এ থেকে কারো কারো এই সন্দেহ হয়ে গেছে,

'এখানে হুকুম দ্বারা ইসলামী শরীয়তের সকল বিধান উদ্দেশ্য। কাজেই যদি মুসলমানদের আয়ত্বাধীন কোন রাষ্ট্রে শরীয়তের সকল বিধান জারি না থাকে তাহলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে না।'

কিন্তু এ কথা দুরস্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম বলে প্রতীয়মান হওয়ার জন্য জন্য মূল বিষয় হচ্ছে তাতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা থাকা এবং তাতে তাদের আহকাম জারি করার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা। এরপর যদি তারা তাদের গাফলতি এবং ত্রুটির কারণে সকল আহকাম জারি না করে তাহলে এটা তাদের জন্য মারাত্নক গুনাহ| শরীয়তের সকল আহকাম জারি করা তাদের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু তাদের এই আমার্জনীয় গাফলতির কারণে উক্ত রাষ্ট্র দারুল ইসলামের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে না।

তুমি দেখেছ, আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় শুধু এতটুকু বলেছেন, তা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে|

আর এ বিষয়টাকেই জামিউর রুমুজের বক্তব্যে এভাবে বলা হয়েছে, **"তাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর শাসন চলে"। অর্থাৎ তার আইন কার্যকর হয়। ঐ আইন শরীয়তসম্মত কি'না তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি।**

যেহেতু ঐ যামানায় 'কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে থাকা সত্বেও তার অধিবাসীরা তাতে ইসলামী আহকাম জারি করবে না, তা কল্পনা করাও মুশকিল ছিল , ফলে ঐ যামনায় সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়নি, মুসলমানদের অধিনস্থ কোন রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি না থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে কি'না। বরং শুধু এতটুকু বলার উপর ক্ষ্যান্ত করা হয়েছে, "'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে এবং তাতে তাদেরই হুকুম চলে"।

কিন্তু পরবর্তী যামানায় মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যখন এমন সূরত সামনে আসলো, 'কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের ক্ষমতাধীন কিন্তু তাতে ইসলামী শরীয়ত পরিপূর্ণ জারি নেই' তখন পরবর্তী যামানার ফুকাহাগণ তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন {যে, এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম}।

যেমন- আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

" وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلُّها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم و بعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، و لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها."

"এ থেকে বুঝে আসে, শামের 'তাইমুল্লাহ্' পাহাড় যাকে 'দারুয পাহাড়'ও বলা হয় এবং এর অন্তর্গত আরো কতক শহর সবগুলোই দারুল ইসলাম। কেননা সেগুলোর শাসক যদিও দারুয বা নাসারা এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিচারকও রয়েছে যারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে, তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে কটুক্তি করে থাকে; কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলমান শাসকদের অধীনস্থ। দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুসলমান শাসকগণ যখনই চাইবেন তাদের উপর আমাদের আহকাম জারি করে দিতে পারবেন।"

('রদ্দুল মুহতার', কিতাবুল জিহাদ, 'বাবুল উশরি ওয়াল খারাজ' এর একটু আগে 'ইসতি'মানুল কাফের' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬৬০, নতুন সংস্করণ।)

এ থেকে এ বিষয়টি আরোও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য মূল গুরুত্ব হলো তাতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ কব্জা ও ক্ষমতা আছে কি'না। যদি পরিপূর্ণ ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে ঐ রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলা হবে এবং তার উপর দারুল ইসলামেরই আহকাম জারি হবে। যদিও মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে তাতে পরিপূর্ণরূপে শরীয়ত জারি হতে না পারে।]

[ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩২৪-৩২৭]

সামনে গিয়ে বর্তমান মুসলমান নামধারী শাসকদের দখলে থাকা কুফরী আইন দ্বারা শাসিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম দাবি করে তিনি বলেন-

اور چونکہ ان میں سے ہر ملک میں اقتدار مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں ہے اس لئے ان میں سے ہر ایک پر دار الاسلام کی تعریف بھی صادق آتی ہے-

[যেহেতু এ সব রাষ্ট্রের প্রত্যেকটার ক্ষমতা মুসলমানদেরই হাতে, এ কারণে এগুলোর প্রত্যেকটার উপর দারুল ইসলামের সংজ্ঞা প্রযোজ্য।]
[ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩৩১]

তাঁর এ দুই বক্তব্যে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, (বর্তমান মুসলিম নামধারী শাসকগোষ্ঠী যদিও কুফরী আইন দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করছে তবুও তারা মুসলমান। তাদের ক্ষমতাধীন রাষ্ট্রগুলো ‘দারুল ইসলাম’ তথা ইসলামী রাষ্ট্র। শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০) এবং আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আর আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।)

আমরা আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যগুলোকে পর্যালোচনা করে দেখবো, তাঁদের বক্তব্যগুলো থেকে তাঁর এ দাবির কোন সমর্থন পাওয়া যায় কি’না। সাথে সাথে তাঁদের এ বক্তব্যগুলোর প্রকৃত প্রয়োগ ক্ষেত্র কী হবে তাও আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

***

আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহের পর্যালোচনাঃ

পর্যালোচনার সারকথাঃ

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০হি.) এর যামানায় কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। যেমনটা তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. নিজেও স্বীকার করেছেন।

কাজেই তাঁর বক্তব্যঃ “‘দারুল ইসলাম’ ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে” দ্বারা এ কথা কীভাবে বোঝা যাবে, কুফরী আইন দিয়ে পরিচালিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম ?! কুফরী আইন তো তাঁর যামানায় ছিলই না।

বরং তাঁর যামানায় যেহেতু পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম ছিল কাজেই 'মুসলমানদের হাতে থাকা'র দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য, মুসলমানরা তাতে নিরাপত্তার সাথে শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারে।

অতএব, তাঁর বক্তব্য থেকে যেসব রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম রয়েছে সেগুলো দারুল ইসলাম বোঝা যায়। কুফর শাসিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না।

আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্যঃ "'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যেখানে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর শাসন চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে।"

এখানে **'ইমামুল মুসলিমীন'** একটা পরিভাষা। আর পরিভাষার একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে। সম্ভাব্য সকল অর্থই উদ্দেশ্য হয় না।

যেমন, 'সালাত' একটা পরিভাষা। যা একটা নির্দিষ্ট ইবাদাত বোঝায়। সালাতের আভিধানিক অর্থ – দোয়া। কিন্তু পরিভাষায় সকল দোয়াকেই সালাত বলে না।

আল্লামা কূহুসতানী রহ. দারুল ইসলামের সংজ্ঞা প্রদানের পূর্বে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, এখানে 'ইমামুল মুসলিমীন' দ্বারা আহলুল হল ওয়াল আকদ কতৃক বাইয়াতকৃত শরয়ী ইমাম উদ্দেশ্য।

তদ্রুপ এখানে 'ইমামুল মুসলিমীনের শাসন' দ্বারা সব ধরণের শাসন উদ্দেশ্য নয়। জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম, ঈমানী-কুফরী সব ধরণের শাসন উদ্দেশ্য নয়।

বরং এখানে 'ইমামুল মুসলিমীনের শাসন' দ্বারা ইসলামী শাসন উদ্দেশ্য। কেননা ইমাম নিযুক্ত করাই হয় ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য।শরীয়তের বিরোদ্ধাচরণের জন্য নয়। যে ইমাম শরীয়তের বিরোদ্ধাচরণ করে সে আর ইমাম হওয়ার যোগ্য থাকে না। তাকে সরিয়ে ফেলা উম্মতের উপর ওয়াজিব।

তদ্রুপ তাঁর বক্তব্যঃ 'মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে' দ্বারা দ্বীন পালন সহ নিরাপত্তা উদ্দেশ্য। যে নিরাপত্তা লাভের জন্য দ্বীন বিসর্জন দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তা

উদ্দেশ্য নয়। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. তাঁর ফতোয়ায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

অতএব, কূহুসতানী রহ. এর বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ালঃ "'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যা আহলুল হল ওয়াল আকদ কতৃক বাইয়াতকৃত শরয়ী ইমামের শাসনাধীন রয়েছে। যেখানে ইসলামী আহকাম চলে এবং মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে তাদের দ্বীনের বিধি-বিধান পালন করতে পারে।"

যে রাষ্ট্রে ইসলামী আহকাম চলে না বরং কুফরী বিধান চলে; যেখানে হুদ, কেসাস, জিহাদ সহ দ্বীনের অন্যান্য বিধান বাস্তবায়ন জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয় সেসব রাষ্ট্রকে এই বক্তব্যে 'দারুল ইসলাম' তথা ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়নি।

আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যের সার কথা- আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত শরয়ী আইন দ্বারা শাসিত ইসলামী রাষ্ট্রের একটা অংশে কাফেররা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। মুসলমান শাসকদের উচিৎ ছিল তাদেরকে দমন করা, কিন্তু তারা তা সামর্থ্য থাকা সত্তেও তাদেরকে দমন করেননি। এই সুযোগে কাফেররা সেখানে কুফরী করে বেড়াচ্ছে। এই দমন না করা তাদের অপরাধ।

এ থেকে বোঝা যায়, কোন ইসলামীর রাষ্ট্রের শাসকের শিথিলতার কারণে যদি তাতে অন্যায় অপরাধ এমনকি কুফরীও চলতে থাকে তাহলেও তা দারুল ইসলামই থেকে যাবে। দারুল কুফর হয়ে যাবে না।

কিন্তু এ থেকে কিছুতেই এ কথা বোঝা যায় না, যেসব রাষ্ট্রের শাসকরা আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে সেগুলো সব 'দারুল ইসলাম' তথা 'ইসলামী রাষ্ট্র'।

বিস্তারিত আলোচনা আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যের পর্যালোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

***

পর্যালোচনাঃ

- **ইমাম সারাখসী রহ. (মৃত্যু-৪৯০হি.) এর বক্তব্যের পর্যালোচনাঃ**

মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্তব্যের একটা অংশ উল্লেখ করেছেন।

ইমাম সারাখসী রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যটি নিম্নরূপ-

باب : ما يقطع من الخشب ، وما يصاب من الملح وغيره

(وإذا خرجت سرية بإذن الإمام لقطع الشجر فوصلوا إلى مكان يخاف فيه المسلمون ، ثم قطعوا الخشب وجاءوا به فهو غنيمة يخمس).
لأن الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون من جملة دار الحرب ، فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين ، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون. فإن قيل : كما أن المسلمين لا يأمنون في هذا المكان ، فكذلك أهل الحرب لا يأمنون فيه. قلنا : نعم ، ولكن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب ، فلا تصير دار الإسلام إلا بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه . وهذا ؛ لأن ما كان ثابتا فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره ، ولا يرتفع إلا باعتراض معنى هو مثله أو فوقه ، وإذا ثبت أنه من أرض أهل الحرب فما يكون فيه من الخشب يكون في يد أهل الحرب . فهذا مال أصابه المسلمون من أهل الحرب بطريق القهر ، وهو الغنيمة بعينه .اهـ

বক্তব্যের তরজমায় যাওয়ার পূর্বে ইমাম সারাখসী রহ. কোন প্রেক্ষিতে কথাটি বলেছেন তা জেনে নেয়া যাক।

ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণঃ

সারাখসী রহ. গনীমতের আলোচনায় কথাটি বলেছেন। মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দল দারুল হরব থেকে শক্তি প্রয়োগ করে যে মাল নিয়ে আসে তাকে গনীমত বলে।

গনীমতের বিধান হচ্ছে- তার খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) বাইতুল মালে জমা দিতে হবে। কোন মাল গনীমত হওয়ার জন্য তা দারুল হরব থেকে লাভ করা শর্ত। দারুল হরব থেকে লব্ধ না হলে তা গনীমত হবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, দারুল হরব বলতে কী বুঝায় ?

-যেসব রাষ্ট্র সরাসরি কাফেরদের দখলে আছে সেগুলো তো দারুল হরব হওয়া স্পষ্ট। -তদ্রুপ যে সব রাষ্ট্র সরাসরি মুসলমানদের হাতে আছে, মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে ইসলামী শরীয়ত পালন করতে পারছে, কাফেররা সেখানে মুসলমানদের থেকে আমান (নিরাপত্তা) নেয়া ব্যতীত বসবাস করেতে পারে না – সেগুলো দারুল ইসলাম হওয়াও স্পষ্ট।

-কিন্তু যেসব ভূখন্ড মুসলমানদের হাতেও নেই, কাফেরদের হাতেও নেই সেগুলোর কী বিধান ?

সেগুলো কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব ?

না'কি এ দুটোর কোনটিই নয়; বরং তৃতীয় নতুন আরেকটি প্রকার ?

যদি এসব ভূখন্ড দারুল হরব হয় তাহলে সেখান থেকে লব্ধ মাল গনীমত বলে গণ্য হবে এবং তা থেকে খুমুস নেয়া হবে।

আর যদি দারল হরব না হয় তাহলে তা থেকে লব্ধ মাল গনীমত ধরা হবে না এবং তা থেকে গনীমতের খুমুসও নেয়া হবে না।

সারাখসী রহ. বলেন, এসব ভূখন্ড দারুল হরব । কাজেই সেখান থেকে লব্ধ মাল গনীমত বলে গণ্য হবে এবং তা থেকে খুমুসও নেয়া হবে।

এখন এখানে আপত্তি হতে পারে, এসব ভূখন্ড তো কাফেরদের দখলে নেই, যেমন তা মুসলমানদের দখলেও নেই। মুসলমানরা যেমন সেখানে নিরাপদ নয়, কাফেররাও সেখানে নিরাপদ নয়।

কাফেরদের দখলে যেহেতু নেই কাজেই তা দারুল হরব হয় কীভাবে ?

সারাখসী রহ. জওয়াব দেন-

এসব ভূখন্ড কাফেরদের দখলে না থাকলেও দারুল হরব। কেননা, দারুল হরব হওয়ার জন্য কাফেরদের হাতে থাকা জরুরী নয়। মুসলমানদের হাতে না থাকলেই তা দারুল হরব। চাই তা কাফেরদের দখলে থাকুক বা না থাকুক।

কেননা এসব ভূখন্ড এক সময় কাফেরদের হাতে ছিল। তখন সেগুলো দারুল কুফর ছিল। মুসলমানদের হাতে না আসলে সেগুলো দারুল কুফর হিসেবেই থেকে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবী হয়ে আসলেন তখন সারা দুনিয়া কাফেরদের হাতে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের দ্বারা মানব জাতি ঈমানদার ও কাফের এ দুই দলে ভাগ হয়ে পড়ে। তিনি আল্লাহ তাআলার আদেশে মুমিনদেরকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। মদীনা দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম দারুল ইসলাম। আর বাকি সারা দুনিয়া দারুল কুফর হিসেবেই রয়ে যায়।

এরপর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী যামানার মুসলমানগণ তরবারী হাতে বিশ্বের সকল প্রান্তে ছুটে যান। তাঁরা যেসব এলাকা বিজয় করে সেখানে ইসলামী শাসন কায়েম করতে পেরেছেন সেগুলো দারুল ইসলাম হয়েছে। আর যেগুলোতে ইসলামী শাসন কায়েম

করতে পারেননি সেগুলো আগের মতো দারুল কুফরই রয়ে গেছে। সেগুলো বর্তমানে কাফেরদের হাতে থাকলেও যেমন দারুল হরব, কাফেরদের হাতে না থাকলেও আগে থেকে দারুল হরব ছিল সে হিসেবে এখনো তা দারুল হরব।

মোট কথা- ইসলামী শাসনাধীন নয় এমন সকল ভূখন্ডই দারুল হরব। চাই তা বর্তমানে কাফেরদের হাতে থাক বা না থাক।

অর্থাৎ ঐ তৃতীয় প্রকার ভূখন্ড যা মুসলমানদের হাতেও নেই, কাফেরদের হাতেও নেই সেগুলোও যে দারুল হরব একথা বুঝানোর জন্যই তিনি বলেছেন –

فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين

"দারুল ইসলাম ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে।" অর্থাৎ দারুল ইসলাম হতে গেলে মুসলমানদের দখলে আসা আবশ্যক। যা মুসলমানদের দখলে নেই তা দারুল হরব। চাই তা কাফেরদর হাতে থাকুক বা না থাকুক।

যখন সাব্যস্ত হলো, যে জায়গা থেকে কাঠ আনা হয়েছে তা দারুল হরব, তখন উক্ত কাঠ গনীমত বিবেচিত হবে এবং তা থেকে খুমুস নেয়া হবে।

এবার সারাখসী রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যটির প্রতি লক্ষ্য করি। তাহলেই বিষয়টি বুঝে এসে যাবে ইনশাআল্লাহ।

باب : ما يقطع من الخشب ، وما يصاب من الملح وغيره

(وإذا خرجت سرية بإذن الإمام لقطع الشجر فوصلوا إلى مكان يخاف فيه المسلمون ، ثم قطعوا الخشب وجاءوا به فهو غنيمة يخمس.) لأن الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون من جملة دار الحرب ، فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين ، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون. فإن قيل : كما أن المسلمين لا يأمنون في هذا المكان ، فكذلك أهل الحرب لا يأمنون فيه. قلنا : نعم ، ولكن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب ، فلا تصير دار الإسلام إلا بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه . وهذا ؛ لأن ما كان ثابتا فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره ، ولا يرتفع إلا باعتراض معنى هو مثله أو فوقه ، وإذا ثبت أنه من أرض أهل الحرب فما يكون فيه من الخشب يكون في يد أهل الحرب . فهذا مال أصابه المسلمون من أهل الحرب بطريق القهر ، وهو الغنيمة بعينه .اهـ

"[পরিচ্ছেদঃ যে কাঠ কাটা হয় এবং লবণ বা অন্য যা কিছু লাভ হয় (তার বিধান)

ইমামের অনুমতিক্রমে কোন সারিয়্যা (দল) গাছ কাটতে বের হয়ে যদি এমন স্থানে পৌঁছে যেখানে মুসলমানরা ভয়ে থাকতে হয়, তারপর সেখান থেকে কাট কেটে নিয়ে আসে তাহলে তা গনীমত। তা থেকে (বাইতুল মালের জন্য) খুমুস (এক পঞ্চমাংম) নেয়া হবে।]

{কেননা যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ নয় তা দারুল হরবের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দারুল ইসলাম হচ্ছে ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের হাতে রয়েছে। আর তার (অর্থাৎ মুসলমানদের হাতে থাকার) আলামত হচ্ছে- সেখানে মুসলমানরা নিরাপদ। **যদি বলা হয়** - ঐ ভূখন্ডে মুসলমানরা যেমন নিরাপদ নয়, দারুল হরবের অধিবাসীরাও সেখানে নিরাপদ নয় (তাহলে তা দারুল হরব হয় কীভাবে?)। **(উত্তরে) বলবো** – হ্যাঁ (কথা ঠিক যে, দারুল হরবের অধিবাসীরা সেখানে নিরাপদ নয়।) কিন্তু (এর পরও তা দারুল হরবের অন্তর্ভুক্ত। কেননা,) এসব ভূখন্ড এক সময় হরবী কাফেরদের হাতে ছিল। কাজেই হরবীদের কতৃত্ব সর্ব দিক থেকে নি:শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তা দারুল ইসলাম হবে না। কারণ- যা এক সময় বিদ্যমান ছিল, তার কোন নিদর্শন বাকি থাকলেও তা বিদ্যমান রয়েছে বলেই ধরা হবে। তার সমপর্যায়ের বা তার চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু তার স্থান দখল না করে নেয়ার আগ পর্যন্ত তা দূরীভূত হবে না। অতএব, যখন তা হরবী কাফেরদের ভূখন্ড প্রমাণিত হলো, তখন তাতে যে কাট রয়েছে তা হরবীদের দখলে রয়েছে। অতএব, ইহা (অর্থাৎ কেটে আনা কাঠ) এমন মাল যা মুসলমানরা দারুল হরবের অধিবাসীদের থেকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লাভ করেছে। আর এটাই তো গনীমত।}”

(শরহুস সিয়ারিল কাবীরঃ ৪/২৫২)

বি.দ্র. থার্ড ব্র্যাকেট [ ] যুক্ত অংশটুকু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য। সেকেন্ড ব্র্যাকেট { } যুক্ত অংশটুকু ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যা। আর ফার্স্ট ব্র্যাকেট ( ) যুক্ত অংশটুকু বুঝানোর সুবিধার্থে আমার নিজের থেকে লাগানো।

এবার প্রত্যেক বিবেকবানের নিকট আমার প্রশ্ন:

ইনসাফের সাথে বলুন, ইমাম সারাখসী রহ. কি এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন- [যেসব রাষ্ট্র নামধারী মুসলমান শাসকদের দখলে আছে; যারা সেগুলোতে আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে; মুসলমান জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে তাদের সর্বচেষ্টা ব্যয় করেও শাসকদের দিয়ে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাস্তবায়ন করাতে পারছে না; বরং যারা সহীহ ত্বরীকায় শরীয়ত কায়েম করতে চাচ্ছে জঙ্গী, সন্ত্রাসী ইত্যাদী জঘন্য উপাধীতে ভূষিত করে তাদেরকে দমন করার

জন্য তারা তাদের সর্ব শক্তি ব্যয় করছে; তারা একা তাদেরকে দমন করতে না পেরে আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তির সাথে জোট গঠন করেছে; নিজ দেশে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য যেমন তারা তাদের যাবতীয় সামর্থ্য ব্যয় করছে, বিশ্বের যে কোন প্রান্তের সম্ভাব্য যে কোন ইসলামী শক্তিকে দমন করতেও তারা তেমনই তাদের সর্বসাধ্য ব্যয় করছে; মোট কথা কুফরকে টিকিয়ে রাখতে এবং ইসলামকে মিটিয়ে দিতে যা তাদের সামর্থ্যে আছে তাই তারা ব্যয় করছে']

ঐ আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি যার হাতে আমাদের জান : ইমাম সারাখসী রহ. কি তাঁর এ বক্তব্যে এই ধরণের রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র বুঝাতে চাচ্ছেন ????

কোন বিবেকবান ব্যক্তি দাবি করতে পারবে ইমাম সারাখসী রহ. এই ধরণের কুফরী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে চাচ্ছেন ??

তিনি তো শুধু তাঁর এ বক্তব্যে দারুল হরব সংক্রান্ত একটা আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন । এসব কুফরী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলার কোন ইশারা ঈঙ্গিতও তো এতে নেই। আর কীভাবেই বা তা সম্ভব অথচ তাঁর যামানায় কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। যেমনটা তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. নিজেও স্বীকার করেছেন। কাজেই তাঁর এ বক্তব্য থেকে কীভাবে বোঝা যাবে, কুফরী আইন দিয়ে পরিচালিত এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম ?! কুফরী আইন তো তাঁর যামানায় ছিলই না। বরং তাঁর যামানায় যেহেতু পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম ছিল কাজেই 'মুসলমানদের হাতে থাকা'র দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য, মুসলমানরা তাতে নিরাপত্তার সাথে শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারে।

অতএব, তাঁর বক্তব্য থেকে যেসব রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম রয়েছে সেগুলো দারুল ইসলাম বোঝা যায়। কুফর শাসিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না।

বরং মাবসূতে তো তিনি পরিষ্কার বলেছেন, যে সব রাষ্ট্রে কুফরী বিধান জারি আছে সেগুলো দারুল হরব। তাঁর বক্তব্যটি লক্ষ্য করুন-

فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين، فكانت دار حرب .

[প্রত্যেক ঐ ভূখন্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা কাফেরদের হাতে। কাজেই তা দারুল হরব।]

(আল-মাবসূতঃ ১০/১১৪)

কাজেই সারাখসী রহ. এর বক্তব্য থেকে এসব কুফর শাসিত রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র দাবি করার কোন সুযোগ আছে বলে আমরা দেখছি না।

***

- **'জামিউর রুমুজ' এর বক্তব্যের পর্যালোচনাঃ**

'জামিউর রুমুজ'এ আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যু-৯৫০হি.) বলেন,

دار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين و كانوا فيه آمنين

"দারুল ইসলাম ঐ ভূখন্ড যাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর শাসন চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে।"

(জামিউর *রুমুজ:খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৫৬)

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. বলছেন, এই সংজ্ঞা থেকে বুঝে আসে: বর্তমান কুফরী আইন দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম। কেননা, এখানে বলা হয়েছে, 'যেখানে ইমামুল মুসলিমীনের শাসন চলে' তাই দারুল ইসলাম।

বর্তমানে কুফরী আইন দ্বারা শাসনকারী শাসকরা হচ্ছেন আমাদের ইমামুল মুসলিমীন। আর ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম দ্বারা তার যে কোন হুকুম হোক তাতে কোন অসুবিধা নেই। চাই ইসলামী হোক, চাই কুফরী হোক। চাই শিরকী হোক। কুফর শিরক যাই হুকুম তো চলছে ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম । কাজেই রাষ্ট্র দারুল ইসলাম।

পর্যালোচনাঃ

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. জামিউর রুমুজের পূর্ণ বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেননি। যতটুকু এনেছেন তার আগে-পরে আরো কথা আছে যা জামিউর রুমুজের উল্লিখিত অংশটুকুর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, যার পর আর কারো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।

জামিউুর রুমুজের পূর্ণ বক্তব্যটি তুলে ধরলে পরিষ্করা হয়ে যেত এ বক্তব্যটি তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর দাবির পক্ষে দলীল হয় কি'না।

স্পষ্ট হয়ে যেত এখানে ইমামুল মুসলিমীন দ্বারা কোন ধরণের ইমাম উদ্দেশ্য। কোন ধরণের ইমামের শাসন চললে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হবে বলা হয়েছে এখানে।

আসুন আমরা জামিউর রুমুজের পূর্ণ বক্তব্যটির প্রতি লক্ষ্য করি। 'কিতাবুল জিহাদ' এর শুরুতে কয়েক পৃষ্ঠা পর আল্লামা কূহুসতানী রহ. বলেন-

واعلم أن من أمهات هذا الباب معرفة الإمام والدارين. فالإمام من بايعه أهل الحل والعقد،ونفذ حكمه فيهم خوفا و قهرا. فلا يصير إماما إلا بهذين، كما في النظم وغيره. ودار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين ... كما في الكافي

"ভাল করে জেনে রাখ, এ অধ্যায় (অর্থাৎ জিহাদ) এর ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়গুলোর অন্যতম (দু'টি বিষয়) হচ্ছে: 'ইমাম' (অর্থাৎ ইমামুল মুসলিমীন) এবং 'দারাইন' (তথা দারুল ইসলাম ও দারুল হরব) এর পরিচিতি জেনে নেওয়া।

(শোনো) ইমাম হচ্ছেন তিনি, (১.) আহলুল হল্ ওয়াল আকদ যাকে বাইয়াত দিয়েছেন এবং (২.) তার ভয় ও দাপটের কারণে তার শাসন কার্যকর ভাবে চলছে।

এই দুই শর্ত পাওয়া যাওয়া ব্যতীত (কোন মুসলমান) ইমাম হতে পারবে না। যেমনটা 'নজম' ও অন্যান্য কিতাবে আছে।

আর দারুল ইসলাম হচ্ছে ঐ ভূখন্ড যেখানে ইমামুল মুসলিমীনের শাসন চলছে।... যেমনটা 'আল-কাফি' তে বলা হয়েছে।"

[জামিউর রুমুজঃ ৫৫৪]

এখানে আল্লামা কূহুসতানী রহ. প্রথমে ইমাম বলতে কাকে বুঝায় তা উল্লেখ করেছেন। তার পর বলেছেন,

"দারুল ইসলাম হচ্ছে ঐ ভূখন্ড যেখানে ইমামুল মুসলিমীনের শাসন চলছে।"

অতএব, বিষয়টা স্পষ্টই ছিল যে, ইমামুল মুসলিমীন দ্বারা যে কেউ উদ্দেশ্য নয়। ইমামুল মুসলিমীন দ্বারা ঐ ইমাম উদ্দেশ্য যাকে উম্মতে মুসলিমার আহলে হল্ ওয়াল আকদ বাইয়াত দিয়ে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর শরীয়ত কায়েমের জন্য মুসলমানদের প্রতিনিধিরুপে নির্বাচন করেছেন। এমন ইমামের শাসন চললে তখন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হবে। যারা কাফেরদের সাথে মিলে ইসলামী খেলাফতের পতন ঘটিয়ে কুফরী শাসন

কায়েমের জন্য মুসলমানদের উপর চেপে বসেছে তাদের শাসন চললে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হয়ে যাবে একথা তিনি বলেননি।

এমনকি পরবর্তীতে কেউ এসে যেন যে কাউকে ইমাম দাবি করে রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম দাবি করতে না পারে এ জন্য তিনি প্রথমেই ইমাম কাকে বলে তা পরিষ্করা করে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকি উসমানী দা.বা. এত সুস্পষ্ট বিষয়টাও কেন জানি এড়িয়ে গেলেন। তারপর নিজে থেকেই জামিউর রুমুজের বক্তব্যটির এমন একটা ব্যাখ্যা দিলেন যা সুস্থ বিবেক-জ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। আমরা তাকি উসমানী দা.বা. এর মতো ব্যক্তিদের থেকে এমনটা আশা করিনি। উনাদের মত ব্যক্তিরা যদি এত সুস্পষ্ট বিষয়গুলোর এমন তাহরীফ ও অপব্যাখ্যা করেন তাহলে ওলামায়ে কেরামের উপর থেকে জনসাধারণের আস্থা উঠে যাবে। এর ফলে জনসাধারণ যে গোমরাহির শিকার হবে তার দায়ভার দুনিয়াতে না হোক আখেরাতে হলেও এমন বড় ব্যক্তিদের উপরই বর্তাবে।

***

ইমাম ও ইমামতের বিষয়টাকে আমরা চলুন আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করি।

এখানে তিনটা বিষয়ঃ

১. ইমামত।

২. ইমাম।

৩. ইমাম নির্বাচনকারী আহলে হল্ ওয়াল আকদ।

ইমামত কি?

আল্লামা ইবনে খালদূন রহ. বলেন-

هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ... فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

“ইমামত হচ্ছে, শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় সকলকে চালানো যাতে করে তাদের পরকালীন কল্যাণও অর্জিত হয়, এবং ঐ সমস্ত দুনিয়াবী কল্যাণও অর্জিত হয় যেগুলোর পরিণতি শেষ পর্যন্ত আখেরাতের কল্যাণই দাঁড়ায়।... অতএব, মূলত ইমামত হচ্ছে- শরীয়ত প্রণেতা (তথা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিনিধি রুপে দ্বীন হেফাজত করা এবং দ্বীন অনুযায়ী দুনিয়া পরিচালনা করা।”

[মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদূন : ১৯০]

অতএব, কুফরী শাসন দ্বারা শাসন করা কিছুতেই ইমামত হবে না। আর একে ইমামত না বলা গেলে এ ধরণের শাসককে ইমামও বলা যাবে না।

***

আহলে হল্ ওয়াল আকদ কারা?

আহলে হল্ ওয়াল আকদ হচ্ছেন উম্মাহর ঐ সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি যাদের পছন্দ গোটা উম্মাহর পছন্দ বলে গণ্য হবে।

তবে যে কেউ আহলে হল্ ওয়াল আকদ হওয়ার দাবি করার সুযোগ নেই। আহলে হল্ ওয়াল আকদ হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে।

আল্লামা মা ওয়ারদি রহ. বলেন-

فَأَمَّا أَهْلُ الِاخْتِيَارِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ ثَلَاثَةٌ : أَحَدُهَا : الْعَدَالَةُ الْجَامِعَةُ لِشُرُوطِهَا. وَالثَّانِي : الْعِلْمُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا. وَالثَّالِثُ : الرَّأْيُ وَالْحِكْمَةُ الْمُؤَدِّيَانِ إلَى اخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلْإِمَامَةِ أَصْلَحُ، وَبِتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ أَقْوَمُ وَأَعْرَفُ.اهـ

“ইমাম নির্বাচনকারী (আহলে হল্ ওয়াল আকদ) এর মাঝে তিন শর্ত বিবেচ্য:
এক. পরিপূর্ণ শর্তাবলী সহ আদালত তথা ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা বিদ্যমান থাকা।
দুই. পরিপূর্ণ শর্তাবলী বিশিষ্ট উপযুক্ত ইমাম নির্বাচনের পর্যাপ্ত ইলম থাকা।
তিন. ইমামতের সর্বাধিক উপযুক্ত এবং কল্যাণমূলক পরিচালনায় সর্বাধিক যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিটিকে নির্বাচন করতে পারার মত রায় ও হিকমত থাকা।”

[‘আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ’- লিল মা ওয়ারদি রহ. : ১৭-১৮]

আহলে হল্ ওয়াল আকদ এর জন্য যে কাউকে ইমাম নির্বাচন করার সুযোগ নেই। ইমাম হতে নির্দিষ্ট যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আর তাদেরকেই কেবল ইমাম হিসেবে নির্বাচন করা যাবে।

আল্লামা মা ওয়ারদি রহ. বলেন-

فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلِاخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ شُرُوطُهَا فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَكْمَلَهُمْ شُرُوطًا وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إِلَى طَاعَتِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ.اهـ

"ইমাম নির্বাচনের জন্য যখন আহলে হল্ ওয়াল আকদ একত্রিত হবে, ইমামতের উপযুক্ত পর্যাপ্ত শর্তবিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্থা যাছাই করে দেখবে। অত:পর তাদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে ইমামতের জন্য নির্বাচন করবে যার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। ইমামতের শর্তগুলো যার মাঝে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। দ্রুতবেগে লোকজন যার আনুগত্যের দিকে ছুটবে। যাকে বাইয়াত দেয়ার ব্যপারে লোকজন কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব করবে না।"
['আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ'- লিল মা ওয়ারদি রহ. : ২৫]

ইমামের মধ্যে কি কি শর্ত পাওয়া যেতে হবে?

ইমামের জন্য অনেক শর্ত। যেমন-

১. মুসলমান হওয়া।

২. পুরুষ হওয়া।

৩. বালেগ হওয়া।

৪. আদেল তথা নেককার হওয়া, ফাসেক না হওয়া।

৫. শরয়ী আদালতের কাজী তথা বিচারক হওয়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া।

৬. যে কোন পরিস্থিতিতে সঠিক সমাধান ও সিদ্ধান্ত দেয়ার মত যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া।

৭. সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অনুভূতি সম্পন্ন হওয়া।

৮. হুদুদ, কেসাস সহ শরীয়তের অন্যান্য আহকাম বাস্তবায়নে সক্ষম হওয়া।

৯. ইসলামের ভূমি হেফাজত করা এবং কাফের মুশরেকদের বিরোদ্ধে জিহাদ করার মত বীরত্ব ও সাহসের অধিকারী হওয়া।

১০. কুরাইশ বংশের হওয়া।

[দেখুন : 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ'- লি আবি ইয়া'লা রহ. : ২০, 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ'- লিল মা ওয়ারদি রহ. : ১৯-২০, 'ফতোয়া শামী : ১/৫৪৭-৫৪৮]

শুধু যোগ্যতা থাকলে আর আহলে হল্ ওয়াল আকদ বাইয়াত দিলেই ইমাম হয়ে যাবে না। ইমামতের মূল উদ্দেশ্য শরীয়ত বাস্তবায়ন। যদি জনসাধারণকে শক্তি বলে নিয়ন্ত্রণ করে

শরীয়ত বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য না থাকে তাহলেও ইমাম হবে না।

‘আদ-দুররুল মুখতার’ এ বলা হয়েছে-

(والإمام يصير إماما) بأمرين : (بالمبايعة من الأشراف والأعيان، وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته. فإن بايع الناس) الإمام (ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه) عن قهرهم (لا يصير إماما)

“ দুই শর্ত পাওয়া যাওয়ার শর্তে ইমাম হক ও শরীয়ত সম্মত ইমাম বলে গণ্য হবেনঃ
(১). সম্ভ্রান্ত এবং নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বাইয়াত দেয়া।
(২). তার দাপট ও প্রভাব প্রতিপত্তির ভয়ে জনসাধারণের মাঝে তার শাসন কার্যকর হওয়া।
যদি লোকজন ইমামের হাতে বাইয়াত দেয় কিন্তু তিনি তাদেরকে নিজ শক্তি বলে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তাদের মাঝে তার শাসন কার্যকর হয়নি, তাহলে তিনি ইমাম বলে গণ্য হবেন না।”
[আদ-দুররুল মুখতার : ৪/২৬৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইমামতের ব্যাপারে বলেন-

أَنَّهُ مَتَى صَارَ إِمَامًا، فَذَلِكَ بِمُبَايَعَةِ أَهْلِ الْقُدْرَةِ لَهُ ... وَإِنَّمَا صَارَ إِمَامًا بِمُبَايَعَةِ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْقُدْرَةِ وَالشَّوْكَةِ ... فَإِنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا تَحْصُلُ مَصَالِحُ الْإِمَامَةِ ... اهـ منهاج السنة:530/1

“তিনি কখন ইমাম বলে গণ্য হয়েছেন? তা হয়েছে যখন ক্ষমতাশীলগণ তাকে বাইয়াত দিয়েছেন।... জুমহুরে সাহাবা যারা ক্ষমতা ও দাপটের অধিকারী তাদের বাইয়াতের পরই কেবল তিনি ইমাম বলে গণ্য হয়েছেন। ... কেননা ইমামতের উদ্দেশ্য ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি যার দ্বারা ইমামতের কাংখিত কল্যাণ লাভ হবে।”
[মিনহাজুস্ সুন্নাহ্ : ১/৫৩০]

বি.দ্র.বিশেষ পরিস্থিতিতে ফিতনা দমনের জন্য বা ইসলাম ও মুসলানদের কল্যাণে এমন ব্যক্তিকেও ইমাম বানানো যেতে পারে যার মাঝে ইমামতের সবগুলো গুণ পরিপূর্ণ নেই।

তবে ভালভাবে লক্ষনীয় যে, এ কাজটি করা হবে শুধু ইসলামের কল্যাণে। যেমন, একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ দ্বীনদার, কিন্তু তিনি প্রভূত দাপটের অধিকারী নন। ফলে তিনি ইসলামের শত্রুদেরকে দমন করে ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদেরকে হেফাজত করতে পারবেন না। আরেকজন ব্যক্তি এমন আছেন যিনি পরিপূর্ণ দ্বীনদার নন, কিন্তু তার দাপটের দ্বারা তিনি ইসলামের শত্রুদেরকে দমন করে ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদেরকে হেফাজত করতে পারবেন। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ইমাম বানানো হবে। কেননা, প্রথম ব্যক্তির দ্বীনদারী তার নিজের উপকারে আসলেও তিনি ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদের কল্যাণ সাধনে সমর্থ্য নন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি পরিপূর্ণ দ্বীনদার না হওয়াটা তার নিজের জন্য ক্ষতিকর হলেও তার যে দাপট রয়েছে তা দ্বারা তিনি ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদের কল্যাণ সাধনে সমর্থ্য। আর ইমামত যেহেতু উম্মাহর সাথে সম্পৃক্ত বিষয় কাজেই তাদের কল্যাণকেই প্রাধান্য দেয়া হবে। অতএব, যার দ্বারা উম্মাহর দ্বীন ও দুনিয়ার সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হবে তাকেই ইমাম বানানো হবে। তবে বিশেষ জরুরত না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিপূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ইমাম বানাতে হবে।

যাহোক, ইমাম বানানো হবে ইসলাম হেফাজতের জন্য। আহলুল হল ওয়াল আকদ এমনই একজনকে নির্ধারণ করে তার হাতে বাইয়াত দেবেন। ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদের দ্বীনী ও দুনিয়াবি কল্যাণ সাধনের জন্য যার হাতে বাইয়াত দেয়া হবে তিনিই হবেন ইমামুল মুসলিমীন। আল্লামা কূহুসতানী রহ. এই ধরণের ইমামের শাসন চললে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র হবে বলেছেন। যারা কুফর বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের উপর চেপে বসেছে তারা আইম্মাতুল মুসলিমীন নয়। তারা তাগুত। তারা আইম্মাতুল কুফর। তাদের আনুগত্য করা হবে না, তাদের বিরোদ্ধে কিতাল করা হবে। আর তা চলবে- حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله

(যতক্ষণ না কুফর ও ফাসাদ দূর হয়ে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম হয়।)

***

- **আল্লামা শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর বক্তব্যঃ**

বর্তমান কুফরী আইন দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম প্রমাণ করার জন্য মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. তিনজন ইমামের বক্তব্য এনেছিলেন। আমরা ইতিমধ্যে শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০ হি.) এবং 'জামিউর রুমুজ' এর প্রণেতা আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখেছি এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলার মত কোন দলীল ঐ বক্তব্যগুলোর কোনটাতেই নেই।

এবার রয়ে গেল 'ফাতাওয়া শামী'র প্রণেতা আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.)এর বক্তব্যটি।

আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যটিকে তিনি অত্যন্ত জোরদার একটা দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।

তিনি বলতে চাচ্ছেন-

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০) এবং আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য থেকে তো এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। কিন্তু আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্টই বুঝা যায়।

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর বক্তব্যটি আবার লক্ষ্য করুন। তিনি বলছেন- [যদিও মুসলমানদের হাতে থাকার ফল এই হওয়ার কথা ছিল যে, উক্ত রাষ্ট্রে সকল আইন ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক চলবে, কিন্তু মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যদি পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি নাও থাকে, তবুও যদি ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকে তাহলে তাকে দারুল ইসলামই বলা হবে।

... সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় শুধু এতটুকু বলেছেন যে, তা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে।

আর এ বিষয়টাকেই জামিউর রুমুজের বক্তব্যে এভাবে বলা হয়েছে, "তাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর শাসন চলে"। অর্থাৎ তার আইন কার্যকর হয়। ঐ আইন শরীয়তসম্মত কি'না তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি।

যেহেতু ঐ যামানায় কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে থাকা সত্ত্বেও তার অধিবাসীরা তাতে ইসলামী আহকাম জারি করবে না তা কল্পনা করাও মুশকিল ছিল , ফলে ঐ যামনায় সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়নি, মুসলমানদের অধিনস্থ কোন রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি না থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে কি'না। বরং শুধু এতটুকু বলার উপর ক্ষ্যান্ত করা হয়েছে, "'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে এবং তাতে তাদেরই হুকুম চলে"।

কিন্তু পরবর্তী যামানায় মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যখন এমন সূরত সামনে আসলো যে, 'কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের ক্ষমতাধীন কিন্তু তাতে ইসলামী শরীয়ত পরিপূর্ণ জারি নেই' তখন পরবর্তী যামানার ফুকাহাগণ তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন {যে, এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম}।

যেমন- আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

"وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلُّها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم و بعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، و لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها ".

"এ থেকে বুঝে আসে যে, শামের 'তাইমুল্লাহ্' পাহাড় যাকে 'দারুয পাহাড়'ও বলা হয় এবং এর অন্তর্গত আরো কতক শহর সবগুলোই দারুল ইসলাম। কেননা সেগুলোর শাসক যদিও দারুয বা নাসারা এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিচারকও রয়েছে যারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে, তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে কটুক্তি করে থাকে; কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলমান শাসকদের অধীনস্থ। দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুসলমান শাসকগণ যখনই চাইবেন তাদের উপর আমাদের আহকাম জারি করে দিতে পারবেন।"

('রদ্দুল মুহতার', কিতাবুল জিহাদ, 'বাবুল উশরি ওয়াল খারাজ' এর একটু আগে 'ইসতি'মানুল কাফের' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬৬০, নতুন সংস্করণ।)

এ থেকে এ বিষয়টি আরোও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য মূল গুরুত্ব হলো তাতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ কব্জা ও ক্ষমতা আছে কি'না। যদি পরিপূর্ণ ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে ঐ রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলা হবে এবং তার উপর দারুল ইসলামেরই আহকাম জারি হবে। যদিও মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে তাতে পরিপূর্ণরুপে শরীয়ত জারি হতে না পারে।]

[ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩২৫-৩২৭]

পর্যালোচনাঃ

ইসলামী শাসন জারি না থাকার দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. যামানাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথম ভাগঃ আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) পর্যন্ত।

দ্বিতীয় ভাগঃ আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর পর থেকে আল্লামা শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২হি.)পর্যন্ত।

তিনি বলছেন, যামানার প্রথমার্ধে ইসলামী শাসন সম্পূর্ণ কায়েম ছিল। ইসলামী বিধান জারি না থাকার কল্পনাও তখন করা যেত না।

আর দ্বিতীয়ার্ধে এমন অবস্থাও সৃষ্টি হয়েছে যে, কিছু বিধান জারি ছিল, আর কিছু বিধান জারি ছিলা না। তখন এই প্রশ্ন সামনে এসেছে, এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলা হবে কি হবে না? তখন ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলে গেছেন। কাজেই বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে যদিও ইসলামী শাসন কায়েম নেই, (বরং তার বিপরীতে কুফরী শাসন কায়েম আছে) তবুও সেগুলো আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী দারুল ইসলাম।

এখানে আমাদের প্রশ্নঃ যামানার দ্বিতীয়ার্ধে যে ইসলামী বিধান কিছু জারি ছিল, আর কিছু জারি ছিল না এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য ?

নিম্নোক্ত দু'টি বিষয়ের কোন একটা বা উভয়টা হয়তো উদ্দেশ্য হবেঃ

(এক). 'বিচার ব্যবস্থা ইসলামীই ছিল, কিন্তু শাসকরা জুলুম করতো। অন্যায় অবিচার করতো। বিচারকরা কখনো কখনো শরীয়ত পরিপন্থি ফায়সালা দিয়ে ফেলতো।'

কিন্তু এটা উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ:-

১. এই ধরণের জুলুম অবিচার আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর পরে যেমন ছিল, আগেও তেমনি ছিল। কারণ আল্লামা কূহুসতানী রহ. উসমানী খেলাফতের যামানার মানুষ। উসমানী খেলাফত কায়েম হয়েছে ৯২৩ হিজরিতে। এর আগে খেলাফতে রাশেদা, উমাইয়া খেলাফত এবং আব্বাসী খেলাফত অতিবাহিত হয়েছে। আর এ কথাতো সকলের নিকটই স্পষ্ট যে, খেলাফতে রাশেদার পর উমাইয়া এবং আব্বাসী উভয় যুগেই অনেক জুলুম অত্যাচার এবং অন্যায় অবিচার হয়েছে। বরং এসব যুগে যে জুলুম অত্যাচার হবে তা অনেক হাদিস থেকেও বুঝে আসে। হাজ্জাজের কথা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। কাজেই কূহুসতানীর যামানা পর্যন্ত জুলুম অত্যাচার এবং অন্যায় অবিচার ছিল না এ কথা সহীহ হতে পারে না।

২. এ ধরণের জুলুম অত্যাচার এবং অন্যায় অবিচার কূহুসতানীর যামানা পর্যন্ত নাও যদি থাকতো তবুও তা তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর দাবির পক্ষে দলীল হতো না। কারণ, তখন তো কেবল এতটুকু বুঝে আসতো- ইসলামী শাসন কায়েম থাকলে শুধু জুলুম অত্যাচার এবং অন্যায় অবিচারের কারণে রাষ্ট্র দারুল কুফর হয়ে যায় না। বরং দারুল ইসলামই থেকে যায়।

কিন্তু উনার দাবি তো এটা না। উনার দাবি তো হচ্ছে-শাসন ব্যবস্থা যদি ইসলামী না হয়ে কুফরী হয় তবুও তা দারুল ইসলাম।

অতএব, এ ধরণের জুলুম অত্যাচার এবং অন্যায় অবিচার উদ্দেশ্য হতে পারে না।

এবার তাহলে দ্বিতীয় বিষয়টা উদ্দেশ্য হবে। আর তা হচ্ছে-

(দুই). 'শাসন ব্যবস্থাই ইসলামী ছিল না। বরং বর্তমান যামানার মতো কুফরী শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল। শাসকরা আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত কুফরী সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতো।'

যদি এটাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা দাবির পক্ষে দলীল হবে।

কিন্তু এটাও উদ্দেশ্য হওয়া অসম্ভব। কেননা কূহুসতানী রহ. এর পর আল্লামা শামী রহ. পর্যন্ত মুসলমানদের অধীনস্থ কোন রাষ্ট্রে কখনো কুফরী শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল না। সর্বত্র ইসলামী শাসনই ছিল। তবে হ্যাঁ জুলুম অত্যাচার হয়েছে যা অস্বীকার করার মতো নয়।

তবে কূহুসতানী রহ(মৃত্যুঃ ৯৫০হি.) এর পূর্বে তাতারীদের যামানায় তাদের দখলকৃত রাষ্ট্রগুলোতে 'ইয়াসিক' নামক কুফরী সংবিধানের কুফরী শাসন ছিল। আর এ কারণে আইম্মায়ে কেরাম তাদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়েছেন। যা আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি।

অতএব, এ দ্বিতীয়টিও উদ্দেশ্য হওয়া অসম্ভব।

যখন এ দু'টির একটিও উদ্দেশ্য হতে পারলো না, তখন তাঁর বক্তব্য-

[যেহেতু ঐ যামানায় 'কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে থাকা সত্বেও তার অধিবাসীরা তাতে ইসলামী আহকাম জারি করবে না' তা কল্পনা করাও মুশকিল ছিল , ফলে ঐ যামনায় সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়নি যে, মুসলমানদের অধিনস্থ কোন রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি না থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে কি'না। বরং শুধু এতটুকু বলার উপর ক্ষ্যান্ত করা হয়েছে, "'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে এবং তাতে তাদেরই হুকুম চলে"।

কিন্তু পরবর্তী যামানায় মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যখন এমন সূরত সামনে আসলো যে, 'কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের ক্ষমতাধীন কিন্তু তাতে ইসলামী শরীয়ত পরিপূর্ণ

জারি নেই’ তখন পরবর্তী যামানার ফুকাহাগণ তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন।] দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা আমাদের নিকট স্পষ্ট নয়।

***

এবার বাকি রয়ে গেল আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্য। আসুন আমরা যাছাই করে দেখি তাতে তাকি উসমানী সাহেবের পক্ষে কোন সমর্থন পাওয়া যায় কি’না।

আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যের পর্যালোচনাঃ

আল্লামা শামী রহ. এর এ বক্তব্যটি ‘আদ-দুররুল মুখতার’ এর একটি ইবারতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এসেছে।

‘আদ-দুররুল মুখতার’ এ বলা হয়েছে-

(لا تصير دار الاسلام دار حرب إلا) بأمور ثلاثة: (بإجراء أحكام أهل الشرك، وباتصالها بدار الحرب، وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالامان الاول) على نفسه

[তিন শর্ত পাওয়া যাওয়া ব্যতীত দারুল ইসলাম দারুল হরব হবে নাঃ কাফেরদের বিধান জারি করে দেয়া, দারুল হরবের সাথে মিলিত হওয়া, কোন মুসলমান বা কোন যিম্মি তার প্রথম আমানের দ্বারা নিজের ব্যাপারে নিরাপদ না থাকা।]

[আদ-দুররুল মুখতারঃ ৩৩৮]

এখানে দারুল ইসলাম কখন দারুল হরব হয় সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। দারুল ইসলাম কখন দারুল হরব হয় এ ব্যাপারে আবু হানিফা রহ. এবং সাহেবাইন রহ. এর মাঝে কিছুটা ইখতিলাফ আছে।

রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. তাঁর ফতোয়ায় বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, মূলত আবু হানিফা রহ. এবং সাহেবাইন রহ. এর মাঝে তেমন কোন ইখতিলাফ নেই। কাফেররা দারুল ইসলামের কোন ভূখন্ড দখলা করে নিয়ে তাতে কুফরী বিধান জারি করে দিলে এবং মুসলমানরা তা উদ্ধার করে তাতে ইসলামী বিধান জারি করতে সক্ষম না হলে সকলের

মতেই তা দারুল হরব হয়ে গেছে। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। তবে হ্যাঁ, কাফেররা দারুল ইসলামের যে ভূখন্ড দখল করে নিয়েছে তা যদি দারুল ইসলামের সাথে মিলিত হয় এবং কাফেররা এতটুকু দুর্বল এবং মুসলমানরা এত শক্তিশালী হয় যে, দারুল ইসলাম থেকে মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে অচিরেই কাফেরদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দিতে পারবে তাহলে আবু হানিফা রহ. এর মতে কাফেররা সেখানে কুফরী বিধান জারি করে দিলেও তা দারুল হরব হবে না । আগের মত দারুল ইসলামই থেকে যাবে। কেননা, কাফেররা যেহেতু সেখানে টিকে থাকতে পারবে না বরং অতিশীঘ্রই তাদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দেয়া হবে, কাজেই সেখানে মুসলমানদের শক্তি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি এবং কাফেরদের শক্তি পরিপূর্ণ কায়েম হয়নি। ফলে এখনই তাকে দারুল হরব হয়ে গেছে বলে হুকুম দেয়া হবে না।

আর সাহেবাইন সহ জুমহুর আইম্মার মতে কাফেররা তাতে কুফরী বিধান জারি করে দিলেই তা দারুল হরব হয়ে যাবে। যদিও কাফেররা তাতে টিকে থাকার সামর্থ্য না রাখে, বরং মুসলমানরা অতিশীঘ্রই তাদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দেবে। কাফেরদেরকে সেখান থেকে হটানোর পূর্ব পর্যন্ত তাকে দারুল হরব বলে ধরা হবে এবং তাতে দারুল হরবের বিধানই জারি হবে।

এই মতভেদপূর্ণ সূরতে তারজীহ তথা প্রাধান্য দেয়া হবে কার অভিমতকে ? সাহেবাইনের অভিমতকে না'কি আবু হানিফা রহ. এর অভিমতকে ?

হানাফী ফুকাহায়ে কেরাম এমতাবস্থায় আবু হানিফা রহ. এর অভিমতকে তারজীহ দিয়েছেন। অর্থাৎ কাফেরদেরকে সেখান থেকে হটানোর পূর্ব পর্যন্ত তাকে দারুল ইসলাম বলে ধরা হবে এবং তাতে দারুল ইসলামের বিধানই জারি হবে।

আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যের প্রেক্ষাপটঃ

হুবহু এমনই একটা সূরত আল্লামা শামী রহ. এর যামানায় দেখা দেয়। উসমানী খেলাফতের অধীনস্থ শামের তাইমুল্লাহ পাহাড় এবং তার আশপাশের কয়েকটা শহর

সেখানকার যিম্মি কাফেররা তাদের যিম্মার চুক্তি ভঙ্গ করে তা দখল করে নেয় এবং তাতে তাদের কুফরী বিধান জারি করে দেয়।

[উল্লেখ্য যে, আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্য থেকে দখলদার কাফেররা যিম্মি হওয়াই বুঝে আসছে। তবে সাথে মুসলমান নামধারী যিনদিকরাও ছিল বলে মনে হচ্ছে]

সাহেবাইন সহ অন্যান্য ইমামগণের অভিমত অনুযায়ী তা দারুল হরব হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলটা কোন দারুল হরবের সাথে মিলিত ছিল না। বরং চতুর্দিক থেকেই তা দারুল ইসলাম দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অর্থাৎ তা দারুল ইসলামের অভ্যন্তরস্থ একটা এলাকা ছিল যাতে নাসারা কাফেররা যিম্মি হিসেবে থাকতো।

সাথে সাথে দখলদার কাফেররা এত দুর্বল আর মুসলমানরা এত শক্তিশালী ছিল যে, মুসলমান শাসকগণ চাইলে যে কোন সময় কাফেরদের দখলদারিত্ব খতম করে দিয়ে তাতে ইসলামী বিধান জারি করে দিতে পারেন।

এমতাবস্থায় সাহেবাইন ও অন্যান্য ইমামগণের মতে তা দারুল হরব হয়ে গেছে। কিন্তু আবু হানিফা রহ. এর মতে এখনো তা দারুল হরব হয়নি। বরং দারুল ইসলামই রয়ে গেছে। আল্লামা শামী রহ. এখানে অন্যান্য হানাফী ফকীহগণের অনুসরণ করত আবু হানিফা রহ. এর অভিমতকে তারজীহ দিয়ে উক্ত এলাকাকে দারুল ইসলাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যটি লক্ষ্য করুন। 'আদ-দুররুল মুখতার' এর পূর্বোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

(قوله وباتصالها بدار الحرب) بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام ... قلت: وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها .اهـ

['আদ-দুররুল মুখতার' এর বক্তব্য: "দারুল হরবের সাথে মিলিত হওয়া" , অর্থাৎ সেটি এবং দারুল হরবের মাঝখানে দারুল ইসলামের কোন শহর প্রতিবন্ধক না থাকা। ... আমি বলি: এ থেকে বুঝে আসে, শামের 'তাইমুল্লাহ্' পাহাড় যাকে 'দারুয পাহাড়'ও বলা হয়

এবং এর অন্তর্গত আরো কতক শহর সবগুলোই দারুল ইসলাম। কেননা সেগুলোর শাসক যদিও দারুয বা নাসারা এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিচারকও রয়েছে যারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে, তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে কটুক্তি করে থাকে; কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলমান শাসকদের অধীনস্থ। দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুসলমান শাসকগণ যখনই চাইবেন তাদের উপর আমাদের আহকাম জারি করে দিতে পারবেন।]

[‘রদ্দুল মুহতার’, কিতাবুল জিহাদ, ‘বাবুল উশরি ওয়াল খারাজ’ এর একটু আগে ‘ইসতি’মানুল কাফের’ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৫]

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করুনঃ

উসমানী খেলাফত ইউরোপ ও এশিয়া সহ দুনিয়ার বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। উসমানী খেলাফতের ভয়ে কাফেররা সবসময় ভীত থাকত। আল্লামা শামীর যামানায় খেলাফতের শক্তি কিছুটা কমে এলেও তখনও তা পৃথিবীর অন্যতম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

খেলাফতের সীমান্তবর্তী কোন এলাকা যদি কাফেররা দখল করে নেয় তাহলে তা পুনরুদ্ধার করা হয়তো মুসলানদের জন্য কঠিন। কিন্তু দারুল ইসলামের একেবারে ভিতরের কোন এলাকাতেই যদি সেখানকারই যিম্মি কাফেররা সাময়িক সময়ের জন্য যিম্মার চুক্তির তোয়াক্কা না করে তাদের উপর আরোপিত ইসলামী বিধি বিধান না মেনে তাদের নিজেদের ধর্মের বিধান মানতে শুরু করে এবং সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করতে শুরু করে, তাহলে মুসলমানদের জন্য কাফেরদের এই সাময়িক দখলদারী খতম করা কোনই কঠিন ব্যাপার নয়। বরং খেলাফতের শক্তির তুলনায় তো এসব কাফের হাতির সামনে পিপড়ার সমানও নয়। এ হিসেবে কাফেররা তাতে কুফরী বিধান জারি করে দিলেও মুসলমানদের শক্তি সেখানে পূর্ণই বহাল রয়েছে। কাজেই উক্ত এলাকাকে দারুল ইসলাম বলা অযাচিত কোন মত হবে না। এ কারণেই আল্লামা শামী রহ. একে দারুল ইসলাম ফতোয়া দিয়েছেন।

কিন্তু এর পরও মনে রাখতে হবে, সাহেবাইন সহ অন্যান্য ইমামগণের মতে তা দারুল হরব হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তা উদ্ধার করার মত কোন শক্তি সামর্থ্য যদি মুসলমানদের না থাকে তাহলে তা দারুল হরহ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। এ ব্যাপারে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর ফতোয়ায় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

কিন্তু আল্লামা শামী রহ. তাঁর এই বক্তব্যে এ কথা কোথায় বুঝাচ্ছেন-

[যেসব রাষ্ট্র নামধারী মুসলমান শাসকদের দখলে আছে; যারা সেগুলোতে আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট পরিচালনা করছে; মুসলমান জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে তাদের সর্বচেষ্টা ব্যয় করেও শাসকদের দিয়ে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাস্তবায়ন করাতে পারছে না; বরং যারা সহীহ ত্বরীকায় শরীয়ত কায়েম করতে চাচ্ছে জঙ্গী, সন্ত্রাসী ইত্যাদী জঘন্য উপাধীতে ভূষিত করে তাদেরকে দমন করার জন্য তাদের সর্ব শক্তি ব্যয় করছে; তারা একা তাদেরকে দমন করতে না পেরে আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তির সাথে জোট গঠন করেছে; নিজ দেশে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য যেমন তারা তাদের যাবতীয় সামর্থ্য ব্যয় করছে, বিশ্বের যে কোন প্রান্তের সম্ভাব্য যে কোন ইসলামী শক্তিকে দমন করতেও তারা তেমনই তাদের সর্বসাধ্য ব্যয় করছে; মোট কথা কুফরকে টিকিয়ে রাখতে এবং ইসলামকে মিটিয়ে দিতে যা তাদের সামর্থ্যে আছে তাই তারা ব্যয় করছে'] এমন সব রাষ্ট্র সবগুলো দারুল ইসলাম ??!!

শামীর বক্তব্যে এর কোন আলোচনা বা ইশারা ঈঙ্গিতও কি আছে ?

হ্যাঁ, যদি এমন হতো, বর্তমানে দুনিয়া জুড়ে উসমানী খেলাফতের মত বিশাল এক খেলাফত কায়েম আছে। আর খেলাফতের একেবারে অভ্যন্তরস্থ কোন এলাকা কাফেররা বা মুরতাদরা দখল করে নিয়েছে। যেখান থেকে কাফের মুরতাদদের দখলদারী খতম করা মসলমানদের জন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তাহলে আল্লামা শামী রহ. এর ফতোয়া অনুযায়ী তাকে দারুল ইসলাম বলা যেত।

কিন্তু বর্তমান মুরতাদদের দখলকৃত কুফরী আইন দ্বারা শাসিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার কোন প্রমাণ বা আলোচনা আল্লামা শামী রহ. এর এ বক্তব্যে নেই।

কাজেই আল্লামা শামী রহ. এর এ বক্তব্য থেকে বর্তমান মুরতাদদের দখলকৃত কুফরী আইন দ্বারা শাসিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র দাবি করা যুক্তিযুক্ত নয়।

***

শেষ কথাঃ

দারুল ইসলাম ও দারুল হরব সংক্রান্ত আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহ এবং সেগুলোর সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র দেখার পর বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম বলার কোন সুযোগ আছে বলে আমার কাছে মনে হয়নি। বিশেষত তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. আইম্মায়ে কেরামের যেসব বক্তব্য উল্লেখ করেছেন সেগুলো থেকে কোনভাবেই এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম প্রমাণিত হয় না। কাজেই আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর দাবিকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারছি না। আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে এমনই মনে হয়েছে। হয়তো অন্যদের মত আমার মতের সাথে নাও মিলতে পারে। হয়তো এ কারণে আমার সমালোচনাও হতে পারে। তবে সমালোচক ভাইদের প্রতি আবেদন থাকবে আপনারা দলীলের আলোকে সমালোচনা করবেন। শরীয়তের দলীল চারটিঃ কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস। কুরআন, হাদিস বা ইজমার মুখালিফ-বিরোধী হলে কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। তদ্রূপ কোন ব্যক্তির কথাও দলীল নয়। শরীয়তের চার দলীলের আালোকে যাচাই বাছাইয়ের পর যদি সঠিক বলে প্রমাণিত হয় তাহলে গ্রহণ করা হবে, নতুবা গ্রহণ করা হবে না। এ আলোকেই আপনারা কথা বলবেন। তবে দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের বিষয়টা যেহেতু বর্তমান যামানার একটা জরুরী বিষয় কাজেই এ ব্যাপারে গবেষণা-পর্যালোচনা করে অতি শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা- এই ফিতনার যামানায় তিনি যেন আমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম রাখেন। সব ধরণের ফিতনা থেকে যেন আমাদেরকে হিফাজত করেন। আমীন!

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

****